



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 300 - 320

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কুমারসম্ভবের কবি ও উপমা কালিদাসস্য : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ড. মধুমিতা আচার্য

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, রাঘবপুর ক্যাম্পাস, কলকাতা

Email ID: madhumitaacharya@sxccal.edu



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Historical Novel,
Anachronism,
Ethics, Love,
Human values,
Conflict.

Abstract

'If only I had been born in the era of Kalidasa' (1)—poet Rabindranath Tagore lamented not having been born in that age. Yet, had the poet truly been born in Kalidasa's time, he might have sought to discover the essence of that era—for the advent of such a peerless genius, a man of supreme intellect, defines the very spirit of his age.

Novelist Sharadindu Bandyopadhyay never viewed history as something dry or lifeless; instead, by infusing it with his own imagination and emotion, he presented historical eras in his novels with remarkable vividness. As readers delve into his works, the events seem to unfold right before their eyes, and the dialogues of the characters feel audible. He possessed the unique ability to effortlessly weave the sights, flavors, colors, and scents of history into the fabric of his novels.

Tapan Bandyopadhyay's voluminous novel, *Upama Kalidasasya* could have been a truly enjoyable read had the author avoided anachronisms and refrained from the excessive use of Sanskrit verses. After all, the vast corpus of Sanskrit literature is available for those wishing to explore Kalidasa's poetry and plays; readers can easily access both the original texts and their translations there. Notably, there is already a magnificent, widely acclaimed novel about Kalidasa's life penned by Sharadindu Bandyopadhyay.

Discussion

“আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে।”^১

- কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করেছিলেন কালিদাসের কালে জন্ম না নিতে পারার জন্য। কিন্তু কবি যদি সত্যিই কালিদাসের কালে জন্ম নিতে চাইতেন একটু সমস্যার মধ্যে পড়তেন বৈকি! কারণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারী এই অসামান্য প্রতিভাধর যুগপুরুষের আবির্ভাব-কাল অনির্ধারিত। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস সমস্যা একটি বহুল চর্চিত বিষয়। এবিষয়ে বহু তাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে এবং আরও গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এই কালিদাসকে নিয়েই বাংলা সাহিত্যে

একাধিক গল্প উপন্যাস রচিত হয়েছে। যার মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র উপন্যাসকে ধরে এই আলোচনা। প্রথম উপন্যাস কুমার সম্ভবের কবি লিখেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশ সাল ১৯৬৩/ ১৩৭০। উপন্যাসটির পূর্ব নাম ছিল ‘কালিদাস’ (তখন সেটি চিত্রনাট্যের আকারে প্রচারিত ছিল)। বর্তমানে উপলব্ধ দে’জ সংস্করণ ২০২৩। দ্বিতীয় উপন্যাস উপমা কালিদাসস্য রচয়িতা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশ সাল জানুয়ারি ২০২৫। প্রকাশক দে’জ পাবলিশিং। উপন্যাস দুটিই কালিদাসের জীবনীকেন্দ্রিক এবং সেই সূত্রেই ইতিহাসের গন্ধমাখা।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর তিনিই সম্ভবত বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে পাঠকের সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহ - কালের মন্দিরা, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, গৌড়মল্লার, কুমারসম্ভবের কবি, তুঙ্গভদ্রার তীরে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়। এছাড়াও তাঁর ঐতিহাসিক কাহিনি সমূহ যেমন ‘মৃৎপ্রদীপ’, ‘অমিতাভ’, ‘রক্ত সন্ধ্যা’, ‘বিষকন্যা’, ‘অষ্টম সর্গ’ প্রভৃতি অপরিসীম খ্যাতি লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যেমন অবিসংবাদিত কৃতিত্ব তেমনি হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ অবলম্বন গড়ে ওঠা কাহিনির ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিহাসকে তিনি কখনোই নীরস রূপে দেখেননি, নিজস্ব কল্পনা ও আবেগ মিশিয়ে ঐতিহাসিক যুগকে তিনি এক অসামান্য অনুভবগম্য রূপে উপস্থিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠক যেন চোখের সামনে ঘটনাগুলোকে দেখতে পান, পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনকে শুনতে পান। ইতিহাসের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধকে তিনি অনায়াসেই মিশিয়ে দিতে পারেন তাঁর উপন্যাসে। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রন্থের ‘রোমান্স ধর্মী উপন্যাস : দ্বিতীয় স্তর - শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়’ প্রবন্ধ অংশে লেখক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, -

“শরদিন্দুবাবুর প্রধান কৃতিত্ব অতীত যুগের জীবন যাত্রার পুনর্গঠনে ঐতিহাসিক কল্পনার সার্থক প্রয়োগ, বিশেষত প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের সমাজবিন্যাস ও জীবন ছন্দ সম্বন্ধে তাহার কল্পনা বিশেষ সচেতন ও গঠন শিল্প নিপুণ।”^২

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রতিক সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক। অনুবাদ ও নিজস্ব সৃষ্টিশীল লেখার জন্য তিনি ২০২০ ও ২০২২ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সাহিত্য কর্ম বীরবল, অমরুশতক, তত্ত্বমসি এবং উপমা কালিদাসস্য। আশ্চর্য্য সমাপতন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তপন বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ স্বরূপ - শরদিন্দু গোয়েন্দা ব্যোমকেশ চরিত্রের অমর স্রষ্টা এবং তপন বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য নারী গোয়েন্দা গার্গী চরিত্রের স্রষ্টা। বর্তমানে কুমার সম্ভবের কবি এবং উপমা কালিদাসস্য গ্রন্থ দুটিরই প্রকাশক দে’জ পাবলিশিং।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কুমার সম্ভবের কবি উপন্যাসে কবি কালিদাসের যে কাহিনী আমাদের জানিয়েছেন সে কাহিনীর অবিসংবাদিত নায়ক কালিদাস স্বয়ং। লোকশ্রুতি অনুসারে যুবক কাল পর্যন্ত কালিদাস ছিলেন অশিক্ষিত, মূর্খ ও বোধ-বুদ্ধিহীন। গল্পের শুরুতেই আমরা পাই কালিদাস গাছের এমন ডাল কর্তন করছিলেন যে ডালে তিনি নিজেই বসে ছিলেন। পরে ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে কুন্তল রাজকন্যা হৈমশ্রীর বিবাহ হয় কিন্তু মূর্খ বলেই তিনি কুন্তল রাজকন্যার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে পরে মহাকাল ও দেবী সরস্বতীর বরে ভারতবর্ষের তথা গোটা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারী কবি সার্বভৌম হয়ে ওঠেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি কালিদাস। যুগান্তিক্রমী তাঁর কবি প্রতিভা - আর সেই কাব্যের কারণে ভারতের সারস্বত মন্দিরে তাঁর স্থায়ী আসন।

ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাহিনি শুরু করেছেন এইভাবে -

“একালের কথা নয়, কালিদাসের কালের কাহিনী। জনাকীর্ণ নগরীর রাজপথ দিয়া এক হরিচন্দন চিত্রিত হস্তী রাজকীয় মন্তরতায় হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। স্কন্ধে অঙ্কুশধারী মাহুত; ...”^৩

সে তখন ঘোষণা করছে, -

“শোন সবাই-মহারাষ্ট্র কুন্তল দেশের কুমার-ভট্টারিকা পরমবিদুষী রাজকন্যা হৈমশ্রী স্বয়ংবরা হবেন।
সামন্ত-শ্রেষ্ঠী, চণ্ডাল-পামর, সকলে শ্রবণ কর- জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলে এই স্বয়ংবর সভায় যোগ
দিতে পারবে,”^৪

কুমারসম্ভবের কবি উপন্যাসের শুরুতেই কুন্তল রাজকন্যা হৈমশ্রীর স্বয়ম্বর সভার ঘোষণা জানা যায়। এই স্বয়ম্বর সভায় সামন্ত শ্রেষ্ঠী চণ্ডাল পামর সকলেই অংশ নিতে পারবে বলে ঘোষণা ঘোষণা করে। গোটা ভারতবর্ষময় কুন্তল রাজকন্যার স্বয়ম্বরের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল আর তাতে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশ থেকে রাজা ও রাজপুরুষেরা কুন্তলদেশ অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এদেরই মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ মকরবর্মা। আমরা জানতে পারি তাঁর গৃহে সাতটি মাত্র রানী, এবং অষ্টমটিকে সংগ্রহ করতে যখন তিনি কুন্তল রাজ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন তখনই ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়ার পথে ঘর্মান্ত কলেবরে তিনি পুষ্করিণীর সন্ধান করে স্নান করে নিতে চান এবং গ্রাম্য যুবক কাঠ কাটায় নিরত কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করেন সামনের পুষ্করিণীর জল ভালো কিনা। তাঁর মনের ইচ্ছা ছিল পুষ্করিণীর তীরবর্তী গাছের সঙ্গে ঘোড়াটিকে বেঁধে রেখে পুষ্করিণীতে স্নান করে নতুন পোশাক পরে কুন্তল রাজ্যে প্রবেশ করবেন। স্নানের উদ্দেশ্যে মকরবর্মা ঘোড়া বেঁধে নেমে যাওয়ার পর কালিদাস নিজের কাঠ কাটার কাজে আর মনোনিবেশ করতে পারেন না। তিনি একটি করে রাজপুত্রের সকল পোশাক দেহে ধারণ করেন, শিরোজ্ঞাণ্ড তাঁর মাথায় চমৎকার এঁটে যায়। এরপর তিনি আবার নতুন করে গাছের ডাল কাটায় মনোযোগ দেন - ডালটি পূর্ব থেকেই জখম ছিল এখন নতুন আঘাতে ডালটি মড়মড় করে কিছুটা ঝুলে পড়ে এবং ঘোড়াটি আত্মরক্ষা করবার জন্য দড়ি ছিঁড়ে ছুট লাগায়। এরই মধ্যে ঘোড়ার পিঠে পড়েন ব্রাহ্মণ সন্তান কিন্তু কাঠ কাটায় রত কালিদাস এবং ঘোড়া সোজা কুন্তল রাজধানী অভিমুখে ছুটে চলে।

কুন্তল রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে কালিদাস খুব বিভ্রান্ত, ইতস্তত বোধ করছিলেন কিন্তু দ্বাররক্ষীগণ তাঁকে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ বলে ধরে নেয় এবং মহামন্ত্রী তাঁর চরণদ্বন্দ্ব বন্দনা করেন। কালিদাস জিজ্ঞাসা করেন দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ কি? তখন মহামন্ত্রী তাঁকে পরিহাস প্রিয় বিবেচনা করে বলেন দ্বন্দ্ব মানে হলো দুই। আপনার চরণদ্বন্দ্ব অর্থাৎ আপনার দুই পদ। কিন্তু এখানে প্রশ্নোত্তর পর্বে সময় নষ্ট করবেন না যুবরাজ। আপনি প্রশ্নোত্তরের উপযুক্ত ক্ষেত্র সম্মুখেই পাবেন, চলুন রাজকন্যার সন্নিধানে। রাজকন্যা হৈমশ্রী শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী তিনি আপন প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে যোগ্য পতি নির্বাচন করবেন বলে স্থির করেছিলেন। উপপঞ্চাশ জন প্রার্থী সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি, অবশেষে কালিদাস প্রবেশ করলে তিনি কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করেন সবচেয়ে শক্তিমান কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল দ্বন্দ্ব হয় কাদের মধ্যে? এবং শেষ প্রশ্ন অর্থাৎ তৃতীয় প্রশ্ন ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্ট কী? কালিদাস প্রথম প্রশ্ন ভালো করে শোনেননি। তিনি উপরের আলিসা-স্থিত দুই রক্ষীর যুদ্ধাভিনয় দেখে ভয় পেয়ে মন্ত্রীর গলা জড়িয়ে ধরেন। রাজকন্যা বলেন রাজপুত্র প্রথম প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন এবং তা হলো ভয়। কুমার অভিনয়ের মাধ্যমে তা দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন কালিদাস শোনেন এবং তাঁর কাছে প্রশ্ন সহজ লাগে কারণ তিনি এইমাত্র মন্ত্রীর কাছ থেকে শিখেছেন দ্বন্দ্ব মানে দুই তাই তিনি দুটি অঙ্গুলি তুলে দেখান দুই এবং শেষ প্রশ্ন জগতের সবচেয়ে মিষ্ট কী এ প্রশ্ন কালিদাসের কানে ভালো করে ঢোকেনি। তিনি তখন শুকপক্ষীদের চঞ্চু চুষন নিরীক্ষণ করছিলেন - তাই রাজকন্যা তাঁকে প্রশ্ন করায় তিনি ঐ শুকপক্ষীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন দেখো দেখো। রাজকন্যা বলেন আর্যপুত্র তৃতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন এবং তখনই রাজপুরীতে হলস্থল পড়ে যায় - রাজকন্যা পতি বরণ করেছেন - তা রাষ্ট্র হয়ে যায় গোটা নগরীময়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের এই অংশের বর্ণনা একেবারেই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের মতো। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রহণে লিখেছেন -

“লেখকের ভাষার উপর অধিকার ও বর্ণনা কৌশল প্রশংসনীয় বিশেষত চিত্রল বর্ণনা ও কাব্যের সার্থক ইঙ্গিতের সুষ্ঠু প্রয়োগে তিনি সেই সুদূর অতীতের একটা রূপময় ছবি ফুটাইয়াছেন।”^৫

স্বয়ম্বরের দিন রাতেই কালিদাসের সঙ্গে হৈমশ্রীর বিবাহ হয়। কিন্তু বাসর রাতে হৈমশ্রী জানতে পারেন যিনি তাঁর পাণি গ্রহণ করেছেন সেই কালিদাস উষ্ট্র শব্দটিও সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না বা তাকে শুদ্ধ ভাষায় কী বলে তা তিনি জানেন না, তিনি একটিও বই পড়েননি কিন্তু তাঁর পড়বার ভারী ইচ্ছা। নিজে প্রশ্ন করে প্রার্থী নির্বাচনের পরও এইভাবে ঠকে যাওয়ায় হৈমশ্রী অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং পিতা কুন্তলরাজকে অনুরোধ করে বলেন -

“রাজাধিরাজ, আমাকে রক্ষা করুন, এই গ্রামীণের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।”^৬

কুন্তলরাজ ইতিমধ্যে মকরবর্মার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। মকরবর্মা কুন্তল রাজধানীতে এসে চৌর্যাপরাধে কালিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং তখনকার বিচারে যেহেতু চুরির দণ্ড মৃত্যুদণ্ড তাই কালিদাস নতুন জামাতা হওয়া সত্ত্বেও রাজা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য, এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রী পরামর্শে কুন্তল রাজ কালিদাসকে রাজ্য থেকে বহিস্কৃত করেন। রাতের অন্ধকারে রাজ জামাতার প্রাণ বাঁচাতে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়, বলে দেওয়া হয় যেন ভবিষ্যতে কখনও কুন্তলরাজ্যে তিনি প্রবেশ না করেন। কালিদাস বুঝতেই পারেন না কেনই বা তাঁকে বিয়ে দেওয়া হল, কেনই বা তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কুন্তল রাজ্য অতিক্রম করে বনের প্রান্তদেশে পৌঁছে কালিদাসকে অশ্ব থেকে নামিয়ে দিলে দীর্ঘ অরণ্যাকীর্ণ পথ তিনি পাড়ি দেন, এবং এক সময় ক্লান্ত হয়ে পথেই লুটিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙলে তিনি দেখেন, মহাকাল মন্দিরের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। মূর্খ বলে তাড়িয়ে দেওয়ার কষ্টে কালিদাস মহাকালের কাছে বিদ্যার আশীর্বাদ চান এবং শেষে উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে ঘুরতে দেখেন এক দিব্য কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী বালিকা গান গেয়ে বনপথে চলেছেন, এই বালিকা সরোবরে মিলিয়ে যায়, বালিকার ঐশী গানের সন্ধানে কালিদাস সরোবরে ডুব দেন এবং তখন দেবী সরস্বতী কালিদাসকে কোলে নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন ও বারানসী যাওয়ার পরামর্শ দেন, বলেন সেখানে গেলে তিনি গুরু পাবেন এবং কালিদাস বারানসীতে গিয়ে গুরু লাভ করেন ও পাঁচ বছর পর উজ্জয়িনীতে ফিরে পর্ণকুটির রচনা করে বসবাস আরম্ভ করেন।

কুটিরের দরজায় আলপনা আঁকায় তাঁর পটুত্বের অভাবের পরিচয় পেয়ে মালিনী নামে এক পিতৃ মাতৃহীন মালিনী কন্যা তাঁকে সাহায্য করে দেয় এবং কালিদাসের কবি পরিচয়ের কথা জানতে পেরে মুগ্ধ হয়। মালিনী কালিদাসের কাছে তাঁর কুমারসম্ভবম্ কাব্য পাঠ শুনে মুগ্ধ হয় এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের মহিষী ভানুমতীকে সে ফুল জোগাত, সেইসূত্রে কালিদাসের কাব্য তাঁকে শোনানোর ব্যবস্থা করে, কঞ্চুকী মহারাজের কাছে অন্দরমহলে পুরুষ প্রবেশের অভিযোগ আনলে রাজা লুকিয়ে কালিদাসের কাব্য পাঠ শোনে, মুগ্ধ হন এবং কালিদাসের কাব্যপাঠের জন্য শারদ পূর্ণিমার দিন এক মহতী সভার আয়োজন করেন, সেখানে দেশের সকল কাব্য পিপাসু মানুষকে আমন্ত্রণ জানান হয়। হৈমশ্রীও আমন্ত্রণ পান, কালিদাসের কাব্য শ্রবণকালে হৈমশ্রী তদগত হয়ে পড়েন, শেষে মালিনীর সহায়তায় তিনি কালিদাসের কুটিরে আসেন, সন্ধ্যা দেন, সেই সুযোগে মালিনী শিপ্রা নদীর তীর থেকে কালিদাসকে ডেকে আনতে যান। কালিদাস বলেন –

“কীর্তি যশ সম্মান— তাতে সুখ নেই মালিনী। সুখ আছে শুধু— প্রেমে।”^৭

শিপ্রা নদীর তীরে আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে “মালিনীর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে কবির পানে একবার চোখ পাতিয়া যেন তাঁহাকে দৃষ্টি-রসে অভিষিক্ত করিয়া দিল, তারপর মুখ টিপিয়া বলিল— ‘প্রেমে জ্বালাও আছে কবি’।”^৮ গৃহে ফিরে কালিদাস হৈমশ্রীকে পেলেন, মালিনীর গঁথে দেওয়া মালা হৈমশ্রী কালিদাসের কণ্ঠে পরিয়ে দিল, এবং রাজকন্যা কী করে এই পর্ণকুটিরে থাকবে কালিদাসের এই চিন্তার উত্তরে জানাল, কালিদাসের উমা যদি হিমালয়-রাজগৃহ ত্যাগ করে শিবের পর্ণকুটিরে থাকতে পারেন তাহলে হৈমশ্রী কেন পারবে না? কালিদাসকে এই যুক্তির কাছে নতিস্বীকার করতে হল এবং তখন,

“পূর্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া শারদ পূর্ণিমার চাঁদ উঠতেছে। এইরূপে এক বসন্ত পূর্ণিমার তিথিতে স্বয়ংবর-সভায় যে কাহিনী আরম্ভ হইয়াছিল, আর এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় শিপ্রাতীরের পর্ণকুটিরে তাহা পরিসমাপ্তি লাভ করিল।”^৯

এই উপন্যাসে কালিদাস, বিক্রমাদিত্য, বরাহমিহির প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রকে উপস্থিত করা হয়েছে, এবং কালিদাসের জীবনকে আলোকবৃত্তে রেখে এই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে। মূলত বিদ্যা ও প্রেমের দ্বন্দ্ব ও বিদ্যার সহায়তায় প্রেমের ক্ষেত্রে কালিদাসের রাজকন্যা হৈমশ্রীকে ফিরে পাওয়াই এই উপন্যাসের মূল অভীষ্ট। উপন্যাসের মধ্যে কুমারসম্ভবম্ কাব্য থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু কোথাও তা কাহিনীর ধারাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। যে অনুবাদ ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন শ্লোকের তা অত্যন্ত সুখপাঠ্য। কালিদাসের জীবনকে জানানোর পাশাপাশি কালিদাসের সৃষ্টির প্রতি পাঠক মনে জানার আকাঙ্ক্ষা সধগারে সক্ষম হয়েছেন লেখক। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, -

“শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস ও ছোটো গল্পসংগ্রহ উভয়বিধ রচনারই প্রচুর নিদর্শন দিয়াছেন। তাহার উপন্যাস গুলি সুলিখিত উহাদের আখ্যান ভাগ সুসংবদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক এবং তাহার রচনা রীতি সীমিত বাক্য প্রয়োগ, ভাব গ্রন্থন ও মন্তব্য সংযোজনা প্রভৃতি গুণে সুখ পাঠ্য ও পাঠকের রসবোধের তৃপ্তিদায়ক।”^{১০}

কুমারসম্ভবের কবি উপন্যাসে মালিনী, বন-কুরঙ্গী। সমাজ বাস্তবতার কোন পাঠ তার পড়া হয় নি, তাই সে অনায়াসেই তার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুকে নিঃশর্তে দান করেছে কালিদাসের কাছে। তাই রানী ভানুমতীও তাকে নিয়ে চিন্তিতা ছিলেন। মা, বাবার সাহচর্যে বড় হলে স্বাভাবিকভাবেই মালিনীর মনে এই বোধ কাজ করত যে মালিনীর জীবনে ব্রাহ্মণ পুরুষ অপ্রাপণীয়, সে সেটুকু জানে না বলেই প্রেমে পড়ে, এবং পাঠক ও রানী ভানুমতী সেটুকু জানেন বলেই মালিনীকে প্রথম থেকেই প্রশয় মিশ্রিত স্নেহে ঘিরে রাখেন। শকুন্তলার মতোই সে প্রণয়শরে বিদ্ধা হওয়ার জন্যই সৃষ্ট। শুধু তফাৎ শকুন্তলা বহুবিবাহিত বিলাসী রাজার দ্বারা একপ্রকার প্রতারিতা, কিন্তু মালিনী শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, বিবাহরাত্রেই পত্নীর দ্বারা পরিত্যক্ত কালিদাস কর্তৃক সম্মুখে পালিতা।

এবার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক সময়ের উপন্যাস উপমা কালিদাসস্য প্রসঙ্গে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক। উপন্যাসটি সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি একটি সেমিনারে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজমুখের আলোচনা থেকে। হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ ১০ এপ্রিল, ২০২৬ হাওড়ার রামগোপাল মন্ডে একটি সভার আয়োজন করেন। সেখানে “আধুনিক সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মূল্যায়ন” বিষয়ে বক্তৃতা দেন শ্রীযুক্ত তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই প্রথম তাঁর উপমা কালিদাসস্য উপন্যাসের বিষয়ে শুনি। প্রাচীনযুগের সাহিত্যিকদের বিষয়ে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সেমিনারে জোরের সঙ্গে জানান পূর্বে বাংলা সাহিত্যে কালিদাসের জীবনী নিয়ে কিছু লেখা হয়নি। সেমিনার পরবর্তী আলাপচারিতায় তাঁকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুমারসম্ভবের কবি উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দিলে তিনি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিমায়ে জানান অত্যন্ত খারাপ লেখা, একজন তাকে লিখতে এগিয়ে দিল আর খ্যাতি পেয়ে আর একজনের কাছে চলে গেল - অত্যন্ত অনৈতিক। ফলত তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি পড়ার আলাদা তাগিদ জাগল। বইয়ের প্রচ্ছদে লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, -

“কালিদাসের সমগ্র রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করে কালিদাসের জীবনকাহিনি রচনার প্রচেষ্টা সম্ভবত এই প্রথম। কালিদাস কীভাবে একটির পর একটি রচনার সৃষ্টি করেছিলেন তার এক আশ্চর্য রূপায়ণ ‘উপমা কালিদাসস্য’। জনপ্রিয় পাক্ষিকে ধারাবাহিক প্রকাশের মুহূর্ত থেকে পাঠককুল চিঠি লিখে অকুণ্ঠচিত্তে জানিয়েছিলেন তাঁদের ভালো-লাগা। কিন্তু এই উপন্যাস কোন জীবন-উপন্যাস নয়, এক বিশাল প্রতিভার নিরন্তর সৃজনযাপনের বিস্ময়কর আলেখ্য।”^{১১}

আমরা প্রবন্ধের এই অংশে লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত ভূমিকাকে অনুসরণ করব, তাতে তাঁর সৃজন যাপন পরিস্ফুট হবে। গ্রন্থের ‘লেখকের কথা’ অংশে লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন ধ্রুপদ সংগীতবিদ বজ্রু (পরে ধর্মাস্তরিত বকসু নামে) কে নিয়ে ‘মালবকৌশিক’ লেখার পর তিনি রচনা করেছিলেন বেদ উপনিষদের পটভূমিতে ‘তত্ত্বমসি’। পরে তিনি আকবরের প্রধান সভাসদ ইতিহাসে উপেক্ষিত বীরবলকে নিয়ে রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘বীরবল’। লেখক লিখেছেন-

“বীরবল শেষ করার পর মনে হল গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজসভার প্রধান রত্ন কালিদাসকে নিয়ে লিখছি না কেন! বইপত্র পড়তে শুরু করি, একসময় দেখি কালিদাসের জীবনকাহিনি কোথাও লেখা নেই, শুধু তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি উপকথা প্রচলিত নানা বইয়ে। সেই কাহিনী পড়ে কালিদাসের জীবন সম্পর্কে কোনও ধারণাই গড়ে ওঠে না। তখন পড়তে শুরু করি কালিদাস রচিত চারটি কাব্য ও তিনটি নাটক। একই সঙ্গে পড়তে হল সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের রচনার আগে ও পরে লেখা আরও বহু কাব্য ও নাটক।”^{১২}

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার মস্থন করে লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চাইলেন কালিদাসের মত প্রতিভার সৃজন হয় কেমন করে?

“মূর্খ কালিদাস কীভাবে মহাপণ্ডিত হয়ে এমন সুললিত কাব্য ও নাটক লিখলেন তা গত দু হাজার বছরের এক মহাবিস্ময়। নানা শতকে বহু পণ্ডিত ও গবেষক তাঁর রচনার প্রাঞ্জল অর্থ ও টীকাটিপ্পনী রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর জীবনপঞ্জির হৃদিস দিতে পারেননি কেউ। তাঁর জীবনটাই যেন এক মস্ত প্রহেলিকা।”^{১৩}

লেখক মুখবন্ধে আরো লিখছেন, -

“আমার গবেষণার শুরু ঠিক এই জায়গা থেকে। বহু ইতিহাসগ্রন্থ ও সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিশাল অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলাম সংস্কৃত সাহিত্যের নানা রচনার অন্তর্নিহিত কালিদাসকে। তাঁর জীবনকাহিনি আঁকতে শুরু করলাম তাঁর রচনার ক্রমপর্যায় অনুযায়ী - ‘ঋতুসংহার’ থেকে যে-যাত্রা শুরু করেছিলেন তা শেষ হয়েছিল ‘রঘুবংশ’-এ এসে। মোট চারটি কাব্য ও তিনটি নাটককে রচনার ক্রমপর্যায় অনুযায়ী রেখে আবিষ্কার করতে শুরু করি সেই মহাকবিকে।”^{১৪}

এরপর গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লেখক জানাচ্ছেন কেবল সাহিত্য পাঠ নয়, তাঁর প্রয়োজন ছিল বাস্তবতার পাঠ, -

“বিষয়টা আরো পরিস্ফুট করতে পাড়ি দিলাম কালিদাসের নিবাস মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরে। সারা উজ্জয়িনী শহর, সদাবহমান শিপ্রা নদী, পাহাড়শিখরে মহাকালেশ্বর মন্দির ঘুরে দেখে নিলাম আমার উপন্যাসের পটভূমি। বুঝতে চেষ্টা করলাম ঠিক কোথায় ছিল রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজপ্রাসাদ। যদিও তার বিন্দুমাত্র অবশেষ আর নেই কোথাও, তবু বহু বয়োবৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে কথা বলে আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম একদা জমজমাট রাজপ্রাসাদের অবস্থান।”^{১৫}

ভাবতে ভালো লাগে একজন লেখক কতখানি পরিশ্রম করেন তাঁর সৃজনকে যথাযথ করে তুলতে। লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকায় আরো লিখছেন, -

“কলকাতায় ফিরে আবার নতুন করে নিমজ্জিত হলাম কালিদাসের রচনার মধ্যে হঠাৎ দুহাজার বছর আগের এক আশ্রমে দেখতে পেলাম অধ্যয়নরত কালিদাসকে। কীভাবে তিনি একটু একটু করে হয়ে উঠছেন এক মহান রচয়িতা। যেন দৈববলে কালিদাস এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। একটু একটু করে আবিষ্কার করলাম মহা পণ্ডিত কালিদাসের জীবনচর্যা। তাঁর সৃষ্টির যাত্রাপথ একসময় হয়ে দাঁড়াল আমার লেখার যাত্রাপথ। চার বছর টানা পরিশ্রম করে এক মহান স্রষ্টাকে নিয়ে এই উপন্যাস লিখতে যে পরিমাণ আনন্দ পেয়েছি তা আগে কখনো পাইনি।”^{১৬}

উপন্যাসের লেখকের কথা অংশটি প্রায় পুরোটিই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হল মূলত লেখকের মন ও মানসিকতাকে বুঝে নেওয়ার জন্য। লেখকের এই দাবির বিষয়টি প্রবন্ধের পরবর্তী অংশের আলোচনায় সাহায্য করবে বলেই বিশ্বাস।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস উপমা কালিদাসস্য শুরু হয় এইভাবে -

“শিপ্রা নদীর জল ক্ষীণ স্রোতে বহমান কাক চক্ষু জলে ঝুঁকে পড়লে চোখে পড়ে তার প্রশস্ত কটি অবয়ব। নদীর কিনারে একটি শিশুপা বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট এক যুবকের হাতে কয়েক খণ্ড শিলা, এক একটি শিলা খণ্ড ছুঁড়ে দিচ্ছে নদীর মাঝ বরাবর, সামান্য আবর্তন সৃষ্টি করে শিলাখণ্ডটি হারিয়ে যাচ্ছে জলের গভীরে।”^{১৭}

নিদাঘ অপরাহ্নে এভাবেই যুবকটি সময় কাটাচ্ছে।

“যুবকটির মনে হচ্ছে প্রতিটি শিলাখণ্ড যেন একটি শব্দ। শব্দগুলি আঘাত করছে তার চেতনাব্রক্ষে সৃষ্টি করছে আবর্তের।”^{১৮}

যুবকটির শব্দ সন্ধান পরবর্তীতে তাঁকে এগিয়ে দেবে যশোলোকে।

“তার স্নায়ুতন্ত্রে এখন এরকম অজস্র শব্দের আবর্তন সেই শব্দরাজি অনর্গল ঘুরে বেড়াচ্ছে তার চেতনার চারপাশে এখন সেগুলো পাশাপাশি স্থাপন করাই তার ব্রত তার অভিলাস একটি কাব্য রচনা করার।”^{১৯} এরপর আমরা জানতে পারি এই যুবকটি কালিদাস, সে ঋষি সত্যকামের আশ্রমে থেকে জ্ঞানচর্চা করে। কাব্য রচনা করা তার স্বপ্ন। কিছুদিন আগেই সে ঋষি সত্যকামকে নিজের প্রথম শ্লোক রচনার প্রয়াস দেখিয়েছে এবং সংশোধনের জন্য আদিষ্ট হয়েছে।

কালিদাস ঋষি সত্যকামের আশ্রমে অবস্থান করে, সে গুরুর আশ্রিত। গুরুগৃহে থেকে সে বিদ্যাচর্চা করে। শিক্ষা তিন বছর হওয়ার পর কালিদাস মহর্ষিকে জানায় সে কাব্য রচনায় আগ্রহী।

“মহর্ষি সত্যকাম বললেন, ‘তুমি কি ইতিমধ্যে কোন শ্লোক রচনা করেছ?’

কালিদাস বলেছিল, ‘হ্যাঁ গুরুদেব।’

মহর্ষি স্তম্ভিত হয়ে বললেন, ‘কই দেখি, কী রচনা করেছ?’^{২০}

এরপর গুরুগৃহে অধ্যয়নরত কালিদাস নিদাঘের এক মধ্যাহ্নে শিপ্রা নদীর তীরে শিশুপা বৃক্ষের নীচে বসে নদীর অপর পারে শাল্মল বৃক্ষের নীচে এক নারীকে নগ্ন হয়ে স্নান করতে দেখে এবং বিহ্বল হয়। পরে সে ঐ নারী শরীর দর্শন জনিত আবেশে মুহূর্মুহু শ্লোক রচনা করতে থাকে। প্রথমে ভাবে নারী হয়তো বিবাহিতা, পরে মনে করে নারীটি হয়তো বারবনিতা পরে সে নৌকা যোগে শিপ্রানদী পার হয়ে নারীকে অনুসরণ করে এবং জানতে পারে সে ধনাত্ম শ্রেষ্ঠীপত্নী। পরে কালিদাসের সঙ্গে এই নারীর পরিচয় হয়, সে ইন্দুমতী। বহুপত্নীক বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠীর অসুখী স্ত্রী। কালিদাসের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠী ত্রিশরণ রক্ষিত ইন্দুমতীকে প্রায় দাসীর মতো জীবনযাপনে বাধ্য করে। মহাকালেশ্বর মন্দিরের ত্রিশরণ রক্ষিত তাকে নিয়ে না গেলে ইন্দুমতী নিজেকে সাজায় এবং দাসী ভামতীকে বলে –

“আজই আমি আত্মহত্যা করব।”^{২১}

তখন বৃদ্ধা বিধবা দাসী ভামতী তাকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করে এবং নবপরিচিত যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যেতে বলে। কিন্তু ইন্দুমতী বলে –

“কী করে যাব। আমিও তারে চিনি নে, সেও আমারে চেনে না।”^{২২}

ভামতী তার অভিজ্ঞতা থেকে বলে ভালোবাসলে সে অবশ্যই আসবে। এলে ভামতী তাদের মিলনে সহায়তা করবে বলে আশ্বাস দেয়। পরে কালিদাস শ্রেষ্ঠীর গৃহের কাছে এলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন^{২৩} কাব্যের বড়াই বুড়ির মতোই ভামতী ইন্দুমতীর সঙ্গে কালিদাসের মিলনে সহায়তা করে। পরিত্যক্ত দেবমন্দিরে দু-দুবার ইন্দুমতীর আগ্রহে পরস্পর সঙ্গ মিলিত হয় কালিদাস এবং ইন্দুমতী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এরপর ইন্দুমতী তার দায়িত্ব নিতে বললে কালিদাস জানায় সে অপারগ, সে অন্ত্যবাসী এবং গুরুর ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সে গুরুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে দীর্ঘদিনের জন্য হিমালয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে ইন্দুমতীর জন্য কোন উপায় ভাববে। হিমালয় দর্শন করে ফিরে এসে কালিদাস কাব্য রচনায় আরও মন দেয়। ঋতু বিষয়ক কিছু শ্লোক রচনার পর বিক্রমাদিত্যের আহ্বানে মহর্ষি সত্যকাম তাকে প্রেরণ করেন বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় কাব্য পাঠের জন্য। বিক্রমাদিত্য তখন প্রৌঢ় বয়সে সদ্য তৃতীয় বিবাহ করেছেন। আদি রসাত্মক ঋতু বিষয়ক কাব্য তাঁর অত্যন্ত ভালো লাগে এবং কালিদাসকে তিনি রাজপ্রাসাদে স্থান দেন। রাজ আতিথেয় থেকে কালিদাস কাব্য ও পরে রাজাদেশে নাটক রচনা করে চলে। ইতিমধ্যে ত্রিশরণ রক্ষিত ইন্দুমতীর ছেলে হওয়ার পর তাকে উজ্জয়িনীর থেকে দূরে রেখে চলে আসে আর খোঁজ খবর নেয় না। পরে দীর্ঘদিন অন্বেষণ করে পুত্র সমেত ইন্দুমতীকে ফিরিয়ে আনে কালিদাস এবং তাকে নিয়ে সুখে রাজপ্রাসাদের একাধারে নির্মিত বাসস্থানে থাকতে শুরু করে এবং কাব্য ও নাটক রচনা করে খ্যাতি পায়। এই হল উপমা কালিদাসস্য উপন্যাসের মূল কাহিনি।

উপন্যাসের সমালোচনায় প্রথমেই যেটি বলতে হয় সেটি হল উপমা কালিদাসস্য উপন্যাসের নামকরণ আদৌ সুপ্রযুক্ত হয়নি। লেখকের ভাষাতেই উপন্যাসের মূল বিষয় কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার যাপন-চিত্র, কোন মতেই কালিদাসের রচনায় উপমার অসামান্য অনুভবগম্য ব্যবহার সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা নয়। কালিদাসের উপমার কথা এসেছে, তবে তা তার লেখার প্রশংসার সূত্র ধরে – উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য কালিদাসের উপমা বিশ্লেষণ নয়। ‘উপমা কালিদাসস্য’

এই জনপ্রিয় বাগধারাটি লেখক এই গ্রন্থের নামকরণের জন্য ব্যবহার না করলেই ভালো করতেন। মহাকবি কালিদাসের কাব্যশৈলী ও উপমা ব্যবহারের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত একটি সুবিখ্যাত প্রবাদ প্রচলিত আছে পুরো শ্লোকটি হল—

“উপমা কালিদাসস্য ভাবের্থর গৌরবম্। দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।”^{২৪}

অর্থাৎ, কালিদাসের উপমা বিখ্যাত, ভারবির অর্থগৌরব, দণ্ডীর পদলালিত্য এবং মাঘের মধ্যে এই তিনটি গুণের প্রতিটিই বিদ্যমান। বিশেষত বাংলা সাহিত্যে কালিদাসের উপমা নিয়ে আলোচনার অসামান্য একটি গ্রন্থ রয়েছে শশিভূষণ দাশগুপ্তের উপমা কালিদাসস্য^{২৫} নামে। সে গ্রন্থের নামকরণ এবং আলোচ্য বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং গ্রন্থটিও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

উপমা কালিদাসস্য উপন্যাস সম্পর্কে দ্বিতীয় যে আপত্তির কারণ তা রুচি সম্পর্কিত। ভারতের এবং পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে অবিসংবাদিত এক মহৎ স্রষ্টার জীবনের যে চিত্র লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন তা রুচি বিগর্হিত। উপন্যাসের চরিত্রের সমকালের জীবনদৃষ্টি ও দণ্ডনীতির বিচারে পরস্পর সঙ্গ্রে সহবাস, তাকে অন্তঃসত্ত্বা করা গর্হিত অপরাধ এবং তা মৃত্যুদণ্ড যোগ্য। দেবদত্ত যখন সহপাঠী কালিদাসের এই সম্পর্কের কথা জানতে পারে তখন সে ভীত হয়। বলে – “এই সম্পর্কের কথা যদি কোনও ভাবে রাজা বিক্রমাদিত্যের কর্ণগোচর হয়, তবে—”^{২৬} কালিদাসের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে আরও বলে, “এ ধরনের সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে অপরাধীকে শূলে চড়াতে পারেন রাজা।”^{২৭}

উপমা কালিদাসস্য উপন্যাস সম্পর্কে তৃতীয় অভিযোগ উপন্যাস পাঠক রিসার্চ ওয়ার্ক চান না, চান একটি নিটোল কাহিনি বুনট, যা এই উপন্যাসে পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সংস্কৃত শ্লোকের বহুল ব্যবহারে। কাহিনির গতি ব্যাহত হয়েছে শ্লোক ও তার অনুবাদের মুহূর্মুহ উপস্থাপনে। বলতে খারাপ লাগলেও একথা সত্য যে কালিদাসের কাব্য ও নাট্যাংশের যে অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে, তা অনেকক্ষেত্রেই আড়ষ্ট।

এই উপন্যাস সম্পর্কে চতুর্থ অভিযোগ উপন্যাসে কালিদাস চরিত্রের গতি একমুখী। উপন্যাসের প্রথমাংশে নগ্ন নারী শরীর দর্শন জনিত বিহ্বলতা কালিদাসের মনে প্রথম কাব্য রচনার বিপুল প্রেরণার উৎপত্তি ঘটছে, তার পর কাহিনির ধারা যতই এগিয়েছে ততই নারী শরীরের প্রতি আকর্ষণ ও তজ্জনিত পিপাসাই কাব্য রচনার এক ও একমাত্র চালিকা শক্তি। কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে বাধ্য একমাত্র ইন্দুমতীই কালিদাসের জীবনের স্থায়ীভাব, আর সকল কিছুই এহ বাহ্য। ঋষি সত্যকামের মতো গুরুর সান্নিধ্যে থেকে তিনবছর বেদ, উপনিষদ অধ্যয়ন করেও যদি কোন তরুণের হৃদয়ে এতটুকু সংযম অভ্যাস না হয়, পরস্পর প্রতি আকর্ষণবোধ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা না জাগে তাহলে ধিক তেমন শিক্ষাকে।

গুরুগৃহে থেকে তিনবছর অধ্যয়ন অন্তেই কালিদাস গুরুর দ্বারা আদিষ্ট হচ্ছেন কাব্যরচনায়, - যা ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নের ধারায় অতি স্বল্পকাল। সংস্কৃত শিক্ষায় ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদি শিক্ষান্তে উপনিষদ ও বেদ পাঠের উপযুক্ত হয়ে ওঠে শিষ্য। কাব্য রচনার অধিকার জন্মায় আরও পরে। প্রাচীন ভারতের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনুরাগ সঞ্চারিত ছিল পাঠক হৃদয়ে তা লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় মূল থেকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছেন এই গ্রন্থে।

প্রাচীন ভারত, আশ্রমিক জীবন, ধনীর অটালিকা, রাজ অন্তঃপুর সকল কিছুকেই বুঝি বা লেখক ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব ও জাঁক দেরিদার বিনির্মাণ বাদের তত্ত্বের আলোকে দেখতে ও দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। সর্বত্রই অবাধ কাম ও কাম চালিত মানুষের একাধিপত্য, সংযম, বিবেক বোধ, ধর্ম ভয়, নৈতিকতা, রাজশাসন ভীতি এই সমস্ত কিছুকে তোয়াক্কা না করেই ‘বিলাস কলা কুতুহল’^{২৮} চরিতার্থ করবার এক নিপুণ বিতংস রচনা করেছেন লেখক। পদে পদে কালিদাস ভেবেছে গুরুগৃহে থেকে পরস্পর প্রতি আসক্তি অন্যায়, অধর্ম; কিন্তু তাও সে গোপনে নারীর নগ্ন শরীর দেখবার আকর্ষণে ছুটে গেছে নদীতীরে এবং নিজেকে শিশুপা বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত রেখে যৌবনবতী নারীর সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে স্নান দৃশ্য উপভোগ করেছে। নারীর নগ্ন দেহবল্লরীর শোভা তাঁর রাতের স্বপ্নে উঠে এসেছে, এবং তার বীর্ষস্থলন হয়েছে। নিজেকে অপরাধী বা পাপী ভাবলেও যেহেতু এই ইন্দ্রিয়ময়তা তার সৃষ্টিকুশলতায় ইতিবাচক প্রভাব রাখছে, তাই সে পতঙ্গের মতো ছুটে গেছে রূপবহির দিকে। তরুণ বয়স, দেহের ধর্ম সবই সত্য কিন্তু অচিরেই যাঁর হাত দিয়ে রচিত হবে বিশ্ব বিখ্যাত প্রণয়কাব্য কুমারসম্ভবম্ তাঁকে স্থূল ইন্দ্রিয় দাসত্ব করতে দেখে স্বাভাবিক ভাবেই পাঠক হৃদয়ে আঘাত লাগে।

“কালিদাস ডাকতে চাইল, ইন্দুমতী, শোনো - ইন্দুমতী কোথায় যে হারিয়ে গেল কালিদাস খুঁজেই পেল না। বিভ্রান্ত যুবক তখন দৌড়াচ্ছে। আরও আরও দ্রুতবেগে।

প্রকোষ্ঠের শয়্যা তখন কালিদাসের ঘুমন্ত শরীরে প্রবল অস্থিরতা। সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হলে আবিষ্কার করল এক বিশী অনুভূতি। অনুভব করল নিদ্রাঘোরে বীর্যস্থলন ঘটেছে তার। কী ভয়ঙ্কর ঘটনা। কেন এরকমটা ঘটল! মহর্ষি যদি কোনও ক্রমে জ্ঞাত হন তার এই চরিত্রস্থলনের কথা, নির্ঘাত - কী শাস্তি হতে পারে তার এই অপরাধের তাই সে অনুমান করতে পারল না।”^{২৬}

তার আরও মনে পড়ল যে মহর্ষি প্রায় দিনই বলেন যৌবনে অযথা বীর্যস্থলন অতীব অপরাধ। বীর্য ক্ষয়ের অর্থ মেধা ক্ষয়। মেধা তীক্ষ্ণ ও সজীব রাখতে হলে বীর্যের সংরক্ষণ এক অবশ্য কর্তব্য বিষয়।

“কালিদাস দ্রুত অবগাহন করতে গেল নিকটবর্তী পুষ্করিণীতে। বারবার অঙ্গমার্জনা করেও তার মনে হল এখনো অপরাধমুক্ত হতে পারেনি। প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করে দ্রুত বদলে ফেলে বেশভূষা। দর্পণে বারংবার নিজের মুখাবয়ব দেখেও নিশ্চিত হতে পারছিল না তার অপরাধ নির্ণয় করতে পারবেন কিনা মহর্ষি।”^{২৭}

ঋষি সত্যকামের আশ্রমে শিক্ষার্থীর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কালিদাস কর্তৃক দর্পণের ব্যবহার আমাদের বিস্মিত করে।

একসময় কালিদাসের লেখা আদি রসাত্মক শ্লোক পড়ে সহপাঠী যজ্ঞদত্ত বিস্মিত হয় এবং গুরু সত্যকামকে জানাবে বলে জানায়। কালিদাস খুবই বিব্রত। তার স্মরণে আসছে যে রাতে তার স্বপ্নদোষ ঘটেছিল, বীর্যস্থলন হয়েছিল, সেই সঙ্কেতে ইন্দুমতীর নিরাবরণ শরীরের কথা ভাবতে ভাবতে রচনা করেছিল কিছু শৃঙ্গার রসসিক্ত শ্লোক। এগুলি তার অবকাশ সময় নিজের পাঠ করার জন্য। প্রথম আটটি শ্লোক এর নাম রেখেছিল ‘শৃঙ্গার শতক’ পরবর্তী ছাব্বিশটি শ্লোকের নাম রেখেছিল ‘শৃঙ্গার তিলক’ এবং তার পরবর্তী ছাব্বিশটি শ্লোকের নাম দিয়েছিল ‘পুষ্পবান বিলাস’। তখন কালিদাসের সহপাঠী দেবদত্ত বলে তুমিও গুরুপত্নীর স্নান দৃশ্য দেখতে তা আমি গুরুকে জানাবো। যজ্ঞদত্ত অস্বীকার করে, তখন দেবদত্ত বলে,

“আমি বলছি তুমি দেখতে, সেবার তোমাকে রক্ষা করতে আমি গুরুদেবকে কিছু বলিনি। যজ্ঞদত্ত বলল কোন প্রমাণ আছে। হ্যাঁ যজ্ঞদত্ত যে বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে তুমি দেখতে, তার শাখায় তোমার গাত্র মার্জনী রেখে তুমি চলে এসেছিলে আমি সেই বাস তোমার জন্য তুলে এনে তোমাকে দিয়েছিলাম। সম্ভবত তুমি বিস্মৃত হয়েছো।”^{২৮}

দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে আরো বলে, -

“তুমি কি জোর দিয়ে বলতে পারো রাত্রি কালের শয়্যা শুয়ে অথবা কখনো নির্জনে একা হলে নারী শরীরের কথা ভাবেনি।”^{২৯}

প্রথম আলাপেই যুবক কালিদাসকে ইন্দুমতী বলে তার বুড়া বর। কালিদাস বয়স জিজ্ঞাসা করলে বলে, -

“সত্তর হতে পারে, আশিও। আমি তার কী জানি! শুধু জানি বুড়া কিছু পারে না।”^{৩০}

ভামতী ইন্দুমতীর গর্ভে কালিদাসের সন্তানের বেড়ে ওঠার কথা বললে - কালিদাস ভামতীকে জিজ্ঞাসা করে “এই ছেলে আমার তা কী করে জানা গেল?”^{৩১}

“ও মা গো, ছেলে তোমার হবে না কি ওই সাতকেলে বুড়ার হবে! উনি কি আর কিছু করতে পারেন? সব নরম হয়ে গেছে যে!”^{৩২}

কালিদাসের কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে, বলে, -

“নরম হয়ে গেছে তা তুমি বুঝলে কী করে?”^{৩৩}

“ও মা গো, আমােরও বিছানায় নিয়ে কম কিছু করেছে বয়স কালে! তারপর নরম হয়ে গেলে আর ডাকেনি গো বিছানায়! কিন্তু পুরুষ মানুষের নেশা কি তাতেও যায়! আবার একখানা বিয়া করে ফেলল।”^{৩৪}

এই অংশের বর্ণনা পড়ে যদি বাঙালি বিবাহোৎসবের সময় নরসুন্দরের ছড়া, বা বাচ্চা নাচাতে এসে সমাজের বিশেষ শ্রেণির মানুষগুলি যেমন অনায়াসেই যৌনপ্রসঙ্গ উল্লেখ করে ক্রমাশয়ে টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করে তা, বা বেশ্যালয়ের মাসির উপভোক্তার সঙ্গে কথোপকথনের সুর পাঠকের মনে পড়ে যায় তবে সে দায় একান্তভাবেই পাঠকের, পৃথিবী বিখ্যাত মনীষার জীবনী তথা যাপনচিত্র রচনা করছেন তিনি, কাজেই লেখক হিসাবে তিনি এই দায় নেবেন না।

কিন্তু শুধু ত্রিশরণ বা কালিদাস নয়, গোটা উপন্যাস জুড়ে অনেকেই কামতাড়িত। সত্যকামের আশ্রমের অন্য কোন যুবা লুকিয়ে গুরুপত্নীর স্নান দৃশ্য দেখছে, এ কথা গুরু জানতে পেরে, অনুসন্ধান করা গুরুর পক্ষে সম্ভবমানিকর বিবেচনায় নিজ স্ত্রীর স্নান পর্বের গোপনীয়তা রক্ষার্থে পুষ্করিণীর ধার আবরিত করছেন। কিন্তু সেখানেও বেড়ার আড়াল থেকে গুরুপত্নীর স্নানদৃশ্য দেখেছে যজ্ঞদত্ত এবং সহপাঠী দেবদত্তের কাছে ধরাও পড়েছে গাছের ডালে গাত্রমার্জনী রেখে আসায়।

কালিদাস অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর নগ্ন হয়ে স্নান দৃশ্য নিয়মিত দেখেছে, ইন্দুমতী বৈবাহিক জীবনে সুখী না হওয়ার কারণে পরপুরুষকে যৌনতৃপ্তি দানের জন্য জোর করেছে, বিক্রমাদিত্য নিজ বৌদি (ভ্রাতা রামগুপ্তের বিধবা ও হুনদের দ্বারা অপহৃত) কে এবং কন্যাসমা নারী (জামাতার বৈমাত্রেয় ভগিনী/ পুত্রী)-কে বিবাহ করেছেন, ত্রিশরণ রক্ষিত পরিচারিকার সঙ্গে সহবাস করেছেন এবং নিজ স্ত্রীকে সন্তান সহ ত্যাগ করেছেন। চিত্রশিল্পী মিত্রগুপ্ত রাজার প্রাসাদে থেকে রানির গর্ভাবস্থার চিত্রকল্পের পাশাপাশিই গোপনে রানির নগ্নিকা রূপ এঁকেছেন। এতৎসত্ত্বেও ভারতের সবচেয়ে সুশাসনের যুগে কারও কোন শাস্তি হয়নি। বিক্রমাদিত্যের পিতামহ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য তাঁর ‘দণ্ডনীতি’তে বলেছেন, -

“পতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন লাভ করতে পারবে না। একইভাবে স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যত রাগ বা ঘেঁষ থাকুক স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। ব্রাহ্ম, প্রজাপতি, আর্য ও দৈব এই চার প্রকার বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর ত্যাগ বিহিত হবে না।”^{৩৬}

এই আইন প্রণয়নের পরে মাত্র দুটি প্রজন্মের ব্যবধান ঘটেছে, গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তথা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল চলছে, তখন ৮২ গুপ্তাব্দ, যা শ্রেষ্ঠ শাসকের যুগ বলে চিহ্নিত, সেখানে বিবাহিতা নারীকে পরপুরুষ গর্ভবতী করছেন, স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করছেন, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জাত সন্তানকে নিয়ে কালিদাস ইন্দুমতীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদের রাজার দাঁড়িয়ে থেকে তৈরি করা বাড়িতে আনন্দে কাল যাপন করছেন কিন্তু কোথাও কোন শাস্তির সংস্থান নেই। এমন কি ইন্দুমতী ত্রিশরণ রক্ষিতের পাশে বসে রাজা রানি অভিনীত অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্ নাটক দেখেছে, কিন্তু উত্তরবাস ভালো করে জড়িয়ে নেওয়ায় ত্রিশরণ রক্ষিত তাকে চিনতে পারেননি। তাঁর ‘গভীর গবেষণায়’ কেন কালিদাস সমকালীন ভারতের দণ্ডনীতিকে লেখক অন্তর্ভুক্ত করেননি তা বোধগম্য হল না।

আবার রাজা বিক্রমাদিত্যের দুই সন্তানের জননী স্ত্রী ঘৃতকুমারী, নিজের ছেলে যখন বিক্রমাদিত্যের অসুস্থতার সময় প্রথমবারের জন্য সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হয়েছে এবং স্বামী মৃত্যুশয্যায় সেই অবস্থাতেও কালিদাসকে অনুনয়ন করছেন তাঁর রঘুবংশের শেষাংশ পরিবর্তন করার জন্য, সেই কথার সূত্রেই কালিদাসকে গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে চুষনে চুষনে ভরিয়ে দিচ্ছেন।

ঋষির আশ্রম থেকে, ধনীর হর্ম্য, রাজার প্রাসাদ থেকে জনহীন নদীতীর, পরিত্যক্ত মন্দির থেকে জামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রম কোথাও ব্যভিচারে কোন লাগাম নেই, কোথাও কাম তাড়নায় সাড়া দিতে কোন বাধা নেই। কোথাও কোন সংযম নেই। সবই অবরিত, অনাবৃত, স্থূল ও ইন্দ্রিয়ঘন। এই ইন্দ্রিয়ময়তাই তাঁর উপন্যাসকে টেনে নিয়ে গিয়েছে অন্তহীন রুচিহীনতার পথে। জয়দেবের গীতগোবিন্দম্^{৩৭} কাব্য লেখার মূলে ছিল হরি স্মরণ ও বিলাসকলা কৌতূহল নিবৃত্ত করার যুগল প্রয়াস, কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় স্থিত থাকতে চেয়েছেন কেবলমাত্র ‘বিলাসকলা কুতূহলেই’।

কালিদাসের সঙ্গে ইন্দুমতীর প্রথম মিলন ঘটে ভামতীর তৎপরতায়।

“সম্ভবত ভাদ্র পূর্ণিমা পেরিয়ে গুরুপক্ষ এখন ধাবিত কৃষ্ণপক্ষের দিকে আকাশে কিরণ দেয়ার কথা ভাঙ্গা চাঁদের কিন্তু ভাদ্রের শেষ কয়েকদিন আকাশ মেঘসজ্জায় ভূষিত। তাই এত ঘন তমিশ্র।”^{৩৮}

শ্রেষ্ঠীর গৃহ থেকে দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে এসে ইন্দুমতী আকর্ষণ করল কালিদাসের একটি হাত। মেঘাবৃত সন্ধ্যার অন্ধকারে দুজনে সেই মুহূর্তে দুটি কৃষ্ণবর্ণ অবয়ব। কেউ কারো কাছে দৃশ্যমান নয়, শুধু স্পর্শ করে আছে একে অপরের হাত।

কালিদাস অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করছে ইন্দুমতীর পূর্ণ শরীর। কালিদাসকে ইন্দুমতী টেনে নিয়ে যায় বিগ্রহহীন পরিত্যক্ত দেব দেউলে। কালিদাস তখনও দ্বিধাস্থিত। ইন্দুমতী বলে –

“ভদ্র, স্বর্গের দেব দেবীরাও কি শারীরিক কাম থেকে নিবৃত্ত করেন নিজেদের? তাঁরাও নিয়মিত মিলিত হন তাঁদেরও সন্তান হয়।”^{৪১}

পরক্ষণে ইন্দুমতী আবার বলল –

“তাহলে তো হরগৌরীর মিলনও সম্ভব হত না। ভদ্র জন্ম হত না কার্তিকেয়-র।”^{৪২}

ইন্দুমতী কালিদাসের মধ্যে এমন এক অদ্ভুত অনুভূতি সঞ্চারিত করল যে তার আজীবনের সংস্কার ভেসে গেল কুটোর মত। কালিদাস তখন অতিক্রম করছে –

“এক দীর্ঘ দুর্গম পথ, এক অসম্ভব উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে তার এযাবৎ রক্ষিত কৌমার্য। দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে এক অকর্ষিত শস্যক্ষেত। অনুভবে এক তুমুল আলোড়ন।”^{৪৩}

মৈথুন অস্তে ইন্দুমতী বলল, –

“ভদ্র তুমি আমাকে আজ যা দিয়েছো তা আমার জীবনে প্রথম। পুরুষ স্পর্শ না পেলে নারী জীবনে পূর্ণতা আসে না। আজ আমি পরিপূর্ণ একজন নারী।”^{৪৪}

কালিদাসও স্বীকার করে, “তুমি যা দিলে তা আমার কবি জীবনের পাথেয়।”^{৪৫} ইন্দুমতীর সঙ্গে কালিদাসের দ্বিতীয় মিলন হিমালয় দর্শনের জন্য উজ্জয়িনীতে আসার পর। মহাস্থবির সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ শেষ করার পর শ্রীজ্ঞান যখন কালিদাসকে বিশ্রাম নিতে বলে তখন কালিদাস বলে সে এক মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। এই সাক্ষাতে ইন্দুমতী কালিদাসকে তাকে নিয়ে যেতে বলে নিজের কাছে। ইন্দুমতীর সঙ্গে তার প্রণয় হয়েছে কিন্তু প্রণয়ের পরিণাম বিষয়ে কালিদাস অগ্রপাশ্চাত্য বিবেচনা করেনি এতকাল। ঐ ভাঙা মন্দিরেই –

“কালিদাস তখন গাহন করছে অতলান্ত চিন্তা সমুদ্রে তারি মধ্যে শরীরের প্রবল তাড়নায় অবগাহন করছে ইন্দুমতীর শরীর সমুদ্রে।”^{৪৬}

ইন্দুমতীর কাছ থেকে কালিদাস ফিরে এসে দেখে বৌদ্ধ ভিক্ষুক শ্রীজ্ঞান তার জন্য অপেক্ষা করছে। শ্রীজ্ঞান বলে তোমাকে কাল ভিক্ষুকবেশ ধারণ করতে হবে আজ প্রয়োজন ছিল শরীর শুদ্ধ রাখার। কালিদাস চমকিত হয় তার চোখ মুখ দেখে শ্রীজ্ঞান কি কিছু অনুধাবন করতে পেরেছে? কালিদাস বলল, –

“শ্রীজ্ঞান আমি মনে প্রাণে সর্বদা শুদ্ধ থাকি তুমি হয়তো মহাস্থবিরের কাছে শুনেছ আমি কাব্য রচনা করি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কবির কাছে মূল্যবান প্রতিটি মুহূর্ত থেকে সংগ্রহ করি কাব্য রচনার উপকরণ। আমার হিমালয়ে যাত্রার কারণ ও তাই।”^{৪৭}

হিমালয় যাত্রা থেকে ফিরেই ভামতীর মুখ থেকে কালিদাস জানতে পারে ইন্দু গর্ভবতী।

“আর আশ্চর্য এই যে মাত্র দুদিনের শরীর খেলায় তার গর্ভে ধারণ করেছে কালিদাসের সন্তান। কালিদাস বিষয়টি যতবার চিন্তা করছে তার শরীরে এক অভাবনীয় উত্তেজনা। কালিদাস তাহলে পিতা হতে চলেছে। অথচ সেই সন্তানের মাকে দেখার অধিকার নেই তার।”^{৪৮}

কুমারসম্ভবম্ পাঠকালে হরগৌরীর বিবাহের মাসাধিককাল অতিবাহিত হলেও কুমার কার্তিকের জন্ম চিহ্ন কেন সূচিত হচ্ছে না, রাজ বয়স্য ভানুগুপ্ত এই প্রশ্ন তুললে বিক্রমাদিত্য বলেন, –

“বয়স্য হরগৌরীর মিলন ফলপ্রসূ না-হোক, রাজা বিক্রমাদিত্য ও রানি ঘৃতকুমারীর মিলনের ফলে রানি এখন সন্তানসম্ভবা।”^{৪৯}

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সপক্ষে বলতেই পারেন – “All is fair in love and war.”^{৫০} সিগমুন্ড ফ্রয়েডও তাঁর মনোবিশ্লেষণাত্মক তত্ত্বে বলেছেন, –

“লিবিডো হল জীবনের মৌলিক শক্তির (Eros) সঙ্গে যুক্ত একধরনের মনস্তাত্ত্বিক বা যৌনশক্তি। ফ্রয়েডের মতে, এটি মানুষের সমস্ত মানসিক ও শারীরিক আচরণের মূল চালিকাশক্তি যা বেঁচে থাকার ইচ্ছা, আনন্দ এবং প্রজননসহ মানুষের গঠনমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।”^{৫১}

আমাদের ভারতীয় পরম্পরা কিন্তু চিরকাল থিতু থেকেছে,

“আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি ‘কাম’।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-ধরে ‘প্রেম’ নাম।।”^{৫২}

- এই চেতনায়। নিজের সুখকে ভারতবাসী কোন দিনই প্রাধান্য দেয়নি। ভারতীয় চেতনায় ‘কাম’ হল ঘন তমিশার মতো, যা মানুষকে অজ্ঞানের গভীরে নিয়ে যায়। আর প্রেম হল নির্মল সূর্যের মতো, যা ভাস্বর, সমস্ত অজ্ঞানতাকে যা দূর করে দেয়। তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার লিখেছিলেন, -

“অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।

কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্মল ভাস্কর॥”^{৫৩}

ইন্দুমতীর প্রতি কালিদাসের আকর্ষণকে প্রেম বলব না, কাম বলব; কারণ ইন্দুমতী শ্রেষ্ঠীর গৃহে অসুখী জেনেও নিজের সদ্য প্রাপ্ত রাজ আবাস ও রাজ ভোগ ছেড়ে কালিদাস ইন্দুমতীর উদ্ধারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়নি। কেবলমাত্র নিজের রচনাতৈই মনোনিবেশ করেছে। ত্রিশরণ রক্ষিত ইন্দুকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর কালিদাস খুঁজতে বেরিয়েছে। ত্রিশরণ রক্ষিত রাজার সভায় যাতায়াত করে এবং মহাকালেশ্বর মন্দিরের অভিভাবক তাই পরস্ত্রী আসক্ত কালিদাস অভিযুক্ত হতে পারে এই ভয় কালিদাসকে নিজের গর্ভিণী প্রিয়ার থেকে দূরে রেখেছে।

“প্রাচীন ভারতীয় নীতিশাস্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে দণ্ড শব্দটি গভীর ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হত।”^{৫৪}

কালিদাস এবং রাজ বয়স্য ভানুগুপ্ত মনে করেছেন প্রকৃত অপরাধী ত্রিশরণ রক্ষিত যিনি বৃদ্ধ হয়েও যুবতী ভার্যা গ্রহণ করেছেন। বর্ণ ও লিঙ্গ সাম্য আমাদের অভীক্ষিত হলেও, ঐতিহাসিক উপন্যাসে যুগ প্রতিবেশকে উপেক্ষা করা যায় না। সে যুগে “বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা”^{৫৫} সমাজ নিন্দিত ছিল না। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ও চাণক্য শ্লোকে জীবনের ছয়টি অত্যন্ত উপকারী বিষয়ের বর্ণনায় বলা হয়েছে, -

“সদ্যো মাংসং নবান্নং চ বালান্ধ্রী ক্ষীরভোজনম্।

ঘৃতমুষ্ণেদকশ্লেষব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্॥”^{৫৬}

সদ্য কাটা পশুর মাংস, নতুন ধানের চালের ভাত, অল্পবয়সী যুবতী স্ত্রী, ক্ষীর, ঘৃত, উষ্ণেদক শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের জীবন প্রণালীকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক মন ও মনন নিয়ে সংশোধন করতে বসেছেন। প্রাচীন যুগকে আঁকতে হলে সে যুগের প্রেক্ষাপটে আঁকাই যুক্তিসঙ্গত। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইনের জন্য উনিশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। এখন পর্যন্ত পাত্র-পাত্রীর বয়সের ব্যবধান কত বছরের বেশি হতে পারবে না, সে বিষয়ে কোন আইন নেই। একজন নায়িকাকে পরকীয়ায় জড়িয়ে শারীরিক সুখ ও সন্তান তিনি দিতেই পারেন, কিন্তু ঐ পদ্ধতিতে সমাজ সংস্কারক হয়ে ওঠা যায় না!

লেখক হিসেবে কালিদাসের চরিত্র রচনায় কল্পনাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার সুযোগ লেখকের ছিল - যেহেতু কিছু বিচ্ছিন্ন কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই তেমন ভাবে এই চরিত্র সম্পর্কে জানা যায় না, সেক্ষেত্রে লেখকের কাছে সুযোগ ছিল অমৃত সৃজনের। কিন্তু তিনি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পাঠকের হাতে জীবনদায়ী ওষধি তুলে দেওয়ার বদলে চোঁয়ানো মদ তুলে দিচ্ছেন, তা দিন তাকে আপত্তি করবার নৈতিক অধিকার সমালোচকের নেই, থাকতে পারে না, কারণ কী লিখবেন আর কেমন করে লিখবেন তা একান্তই লেখকের স্বাধীনতা, কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক যুগপুরুষদের নাম ব্যবহার করে যে অনৈতিহাসিক কাহিনি খাড়া করলেন তা শুধু মদ নয় বিষমদ, যা পাঠকের সুস্থ স্নায়ুর মৃত্যুকে অবধারিত করে - আপত্তিটা এইখানে। সত্যকাম, কালিদাস, বিক্রমাদিত্য, শ্রীজ্ঞান, ফা-হিয়েন ইত্যাদি ঐতিহাসিক চরিত্রকে নানান শতাব্দী থেকে তুলে এনে তিনি উপন্যাসের পটভূমিতে স্থাপন করেছেন, যা ভূমিকায় তাঁর দাবি করা গবেষণাধর্মী লেখা কথাতিকে শুধু নস্যাত

করে না, অন্ত ভাষণরূপে চিহ্নিত করে। একজন দু-দুবার সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকের কাছে পাঠক হিসাবে দাবি অনেক বেশি ছিল, যা এই উপন্যাস পড়ে মেটে তো নাই বরং সর্ব অর্থেই সময়ের অপচয় হয়েছে বলে মনে হয়।

বিশেষত এই বই পাণ্ডুলিপি থেকে ছাপার অক্ষরে পরিবর্তিত হওয়ার পর্বে কোন রকম যত্নের ছাপ নেই। কোন প্রুফ রিডিং হয়নি। বানান ও বাক্য গঠনের অজস্র ভুল, পাঠকের শুধু বিরক্তি উৎপাদন করে না, অনেক সময়েই তা গ্রন্থকার কী বলতে চেয়েছেন তা থেকে পাঠককে অনেক দূরবর্তী রাখে। উপন্যাসের প্রথমার্ধ জুড়ে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে ‘ন’, পরিবর্তিত হয়েছে ‘চন্দ্রবিন্দু’তে এবং এই সফটওয়্যার জনিত ত্রুটি পরিমার্জিত হয়নি। একটি গ্রন্থ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়া একজন প্রকাশক এবং লেখকের কর্তব্য তা পালিত হয়নি। পাঠক চারশো নিরানব্বই টাকা খরচ করে প্রুফ না দেখা, অজস্র ভুলে ভরা, বাক্যগঠনে ভুলে ঠাসা, শব্দের বদলে বর্ণগুচ্ছের যথেষ্টাচারে সৃষ্ট তিনশো ঊনষাট পৃষ্ঠার দীর্ঘ উপন্যাস পড়বেই বা কেন? কিনবেই বা কেন? উপন্যাসে দুটি পাতা দুবার করে ছাপা হয়েছে। উপন্যাস পাঠ করতে করতে মনে হয়েছে, ভয়েজ টাইপের মাধ্যমে টাইপ করে, ছেপে চমৎকার বাঁধাই দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছেন প্রকাশক, সেক্ষেত্রে পাঠক কি এটাও ধরে নেবেন যে প্রকাশক প্রুফ কপি দেখিয়ে গ্রন্থকারের যে অনুমতি নেন ফাইনাল প্রিন্টের আগে, তাও নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি, কারণ তা না হলে লেখক এত ভুলে ভরা গ্রন্থ প্রকাশের অনুমতি দেন কী করে! কেউ তো একজন চোখ বুজে ছিলেন, দায়িত্ব পালন করেননি, একথা নিশ্চিত!

উপমা কালিদাসস্য উপন্যাসের আলোচনায় কালানৌচিত্য দোষের প্রসঙ্গ বিষয়ে আলোচনা না করলেই নয়। ইতিহাস এবং কল্পিত কাহিনির সংমিশ্রণ তথা মেলবন্ধনে কীভাবে চমৎকার ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি হয় বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে তার অনেক উদাহরণ আছে। বাংলা ভাষায়ও মনোগ্রাহী ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর। ৩২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক-কাল থেকে ‘গুপ্তাব্দ’ নামক একটি অভিনব অন্ধ-গণনার আরম্ভ হয়েছিল বলে সুধীগণ স্থির করেছেন। কালিদাসের লেখা শুরু হচ্ছে শক আক্রমণ প্রতিহত করে রাজা বিক্রমাদিত্য ফিরছেন সেই সময়ে, লেখক নিজে জানিয়েছেন তখন ৮২ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৩২০+৮২ = ৪০২ খ্রিস্টাব্দ। উপন্যাসের কাহিনি অনুসারে ঐ দিন রাজা বিক্রমাদিত্য নতুন মুদ্রা প্রবর্তন করেন এবং বিক্রমাদিত্যের দৌহিত্রের সিংহাসনারোহণের পরে কালিদাস আহূত হয় তাঁকে কাব্য শোনাতে। স্পষ্ট করে সাল তারিখ উল্লেখ করেছেন লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কারণ অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসেই সাল তারিখের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না। পাঠক হিসাবে আশা করাই যায় এই সময়কাল থেকে কাহিনির সূত্রপাত এবং এরপর তিনটি নাটক ও চারটি কাব্য রচনায় যে সময় ব্যয়িত হচ্ছে উপন্যাসের সকল চরিত্র ও ঘটনা তার সমসাময়িক হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয়নি। সময়ের অসংগতি ও কালবৈষম্য সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ দোষাবহ। লেখকের কথা অংশে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “হঠাৎ দুহাজার বছর আগের এক আশ্রমে দেখতে পেলাম কালিদাসকে।” প্রশ্ন হল তিনি লিখছেন পঞ্চম শতকের কাহিনি এবং লিখছেন একুশ শতকে বসে, মাঝে সময়ের ব্যবধান ষোল শতাব্দীর, সেটা দুহাজার বছর হয় কী করে! দ্বিতীয় কথা তিনি বলেছেন “বহু বয়োবৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে কথা বলে আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম একদা জমজমাট রাজপ্রাসাদের অবস্থান।” দীর্ঘ ষোলোশো বছর আগের প্রাসাদ কোথায় ছিল তা জানতে বয়োবৃদ্ধরা তাঁকে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন বোধগম্য হল না, তখন আশি ছুঁই ছুঁই লেখক না হয় আরও কুড়ি বছরের বৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু ষোলোশো বছরের অন্ধকার কাটাতে এই কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা কী কাজে দেবে বলে লেখক আশা করলেন তা বোঝা গেল না। বিশেষত আমাদের দেশে ইতিহাস সংরক্ষণের চেষ্টা সেই অর্থে প্রায় নেই!

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি অনুসারে কালিদাস মহর্ষি সত্যকামের শিষ্য। ঋষি সত্যকাম বা সত্যকাম জাবাল প্রাচীন বৈদিক যুগে অর্থাৎ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম বা নবম শতাব্দী বা তারও আগে বর্তমান ছিলেন। তিনি মূলত বৈদিক সাহিত্য ও উপনিষদের যুগ তথা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক তথ্যগুলি প্রধানত ছান্দোগ্য উপনিষদ এবং জাবাল উপনিষদে পাওয়া যায়। লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের কোথাও জানানি যে কালিদাসের গুরু মহর্ষি সত্যকাম বহুশ্রুত জাবাল সত্যকাম নন। ভারতবর্ষে সত্যকাম বলে একাধিক ঋষি থাকতেই পারেন, নানা শতাব্দীতে তাঁদের আবির্ভাবও সম্ভব। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোথাও কোন ঐতিহাসিক

চরিত্রের নাম উল্লেখ করলে লেখকের দায় থাকে তিনি যে জনপ্রিয়তম চরিত্র নন তা ঘোষণা করার, এক্ষেত্রে লেখক তা করেননি। জাবাল সত্যকাম কখনোই কালিদাসের গুরু হতে পারেন না, কারণ ঋষি সত্যকাম অনেক প্রাচীন চরিত্র, কালিদাস ও সত্যকাম সমকালীন নন, মাঝে রয়েছে দীর্ঘ প্রায় বারো শতাব্দীর ব্যবধান। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, যিনি 'বিক্রমাদিত্য' নামেও পরিচিত, ৩৭৫ বা ৩৮০ থেকে ৪১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল ভারতের সুবর্ণযুগ। সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করার জন্য তিনি বাকাটক রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন - বাকাটক রাজা দ্বিতীয় রত্নসেনের সঙ্গে তাঁর কন্যা প্রভাবতী গুপ্তের বিবাহ দিয়ে। তিনি গুপ্তের কদর করতেন এবং নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়েই প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন। এই অংশে ইতিহাস অনুসৃত হল। কিন্তু তারই সঙ্গে লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, কালিদাস হিমালয় যাত্রা করেন বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে। ইতিহাস খ্যাত শ্রীজ্ঞান বা অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮২-১০৫৪ খ্রিঃ) ছিলেন প্রাচীন বাংলার একজন বিশ্বখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক এবং ধর্মপ্রচারক। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রসারে এই বাঙালি ভিক্ষু তিব্বত, সুমাত্রা সহ সমগ্র এশিয়ায় এক অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপমা কালিদাসস্য গ্রন্থে রয়েছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে কালিদাস হিমালয় দর্শনে যাচ্ছেন এবং লেখক একটি বারের জন্যও উল্লেখ করেননি যে এই শ্রীজ্ঞান, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নন। ভারত ইতিহাসে নিশ্চয়ই একাধিক শ্রীজ্ঞান থাকতে পারেন, কিন্তু শ্রীজ্ঞান বলতে যাকে মানুষ বোঝেন ইনি যে তিনি নন, তা কোথাও উল্লেখ না করা অপরাধ। আর লেখক যদি সেই শ্রীজ্ঞানের কথাই ভেবে লেখেন তাহলে ভয়াবহ কালানৌচিত্য দোষ ঘটেছে, কারণ কালিদাসের তুলনায় শ্রীজ্ঞান অন্তত পাঁচশো বছরের ছোট। ইতিহাসের গন্ধমাখা কাহিনীতে এই রকম নাম বিভ্রান্তি অত্যন্ত আপত্তিকর।

ব্যক্তি নাম জনিত বিভ্রান্তির পরে আসি বস্তু নাম ও পরিমাপ বিষয়ক ভ্রান্তি প্রসঙ্গে। ভারতীয় উপমহাদেশে ফার্সি ভাষার আগমন ঘটে মূলত একাদশ শতকে। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ শতকে দিল্লি সুলতানদের সময় এটি ভারতের রাজভাষা ও উচ্চ সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের কালিদাস কিন্তু পোশাক পরত। মহর্ষি সত্যকাম হিমালয় যাত্রার পূর্বে কালিদাসকে বলেন, -

“শীত আসন্নপ্রায়। পরিধানের পোশাকের সঙ্গে একটি শীতবস্ত্র সঙ্গে নিও।”^{৫৬}

পোশাক শব্দটিই যখন ভারতে আসেনি, তখন কালিদাসকে পোশাক পরালেন লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এ কম কৃতার্থ নয়! চাদর ও পোশাক শব্দ দুটিই ফার্সি। ‘চাদর’ বা ‘চাদুর’ শব্দটি ফার্সি শব্দ, পরে বাংলায় এসেছে। ফার্সি ভাষায় এর মূল অর্থ হল তাঁবু, শাল, ওড়না, ঘোমটা বা বিছানার আবরণী। এর মূল বা আদি উৎস হলো সংস্কৃত শব্দ ‘ছত্র’ যার অর্থ ‘ছাতা’ বা ‘আচ্ছাদন’। এই ‘ছত্র’ শব্দটি থেকে প্রাকৃত রূপের মাধ্যমে ফার্সিতে ‘চাদর’ শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে গজনভি এবং দ্বাদশ শতকে তুর্কি ও আফগান শাসকদের হাত ধরে ভারতে ফার্সি ভাষার আগমন ঘটে। মিত্রগুপ্তের ঘরে গেলে বয়স্য ভানুগুপ্ত ও কালিদাসের কাছ থেকে শিল্পী চিত্র লুকোলে বয়স্য বলেন, “তোমার চিত্রের কাঁচা রঙ তো লেগে যাবে চাদরে।”^{৫৮}

একর হল ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত ভূমি বা জমির পরিমাপের একটি একক ১ একর সমান ৪৩,৫৬০ বর্গফুট বা ৪,৮৪০ বর্গগজ।

“পণ্যশালা গ্রামের ধনী শ্রেষ্ঠী ত্রিশরণ রক্ষিতের বসত বাড়িটি কয়েক একর জুড়ে। চারপাশে উঁচু পাঁচিল মাঝখানে বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা।”^{৫৯}

একে আমরা কী বলব? ‘আমলাগাছি’? অ্যাংলো স্যাকসন পরিমাপের একক চলে এল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের ভবন বর্ণনায়। ভারতে ঝাড়লঠনের ব্যবহার প্রায় তিনশত বছরেরও বেশি পুরনো। ১৬শ থেকে ১৮শ শতাব্দীতে মুঘল আমলে ইসলামিক ও পার্সিয়ান মোটিফ যুক্ত অলংকৃত ঝাড়বাতির প্রচলন শুরু হয়। তবে ভারতে ঝাড়লঠনের প্রকৃত স্বর্ণযুগ আসে ১৯শ শতাব্দীতে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের কালিদাস কিন্তু বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় ঝাড়লঠনের আলো দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

“কালিদাস দেখল দিনের সভাগৃহ ও রাতের সভাগৃহের পার্থক্য অনেকটাই। সন্ধ্যা পার হতেই জ্বলে উঠেছে চার কোণে চারটি মধ্যম আকারের ঝাড় লঠন ও মাঝখানে একটি বৃহৎ আকারের ঝাড় লঠন।

আলোয় আলো সারা সভাগৃহ। বড় ঝাড় লষ্ঠনটিতে রঙিন আলো থাকায় সমস্ত সভাগৃহে রঙের রোশনাই।”^{৬০}

আবার মহর্ষি সত্যকাম ও মহাস্থবির ধর্মরক্ষিতের আলোচনায় এস্রাজ বাদনের প্রসঙ্গ এসেছে –

“মহর্ষি সত্যকাম বললেন, শুধু কাব্য প্রিয় তা নয় তিনি সঙ্গীত প্রিয় বলেও শুনেছি। মগধ থেকে ধর্মরক্ষিত নামে এক মৃদঙ্গ বাদক মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বাজিয়ে মুগ্ধ করেছে রাজাকে।

মহর্ষি বললেন, তাই নাকি! আমার শিষ্য রুদ্রভট্ট ভালো এস্রাজ বাজায়। কালিদাস রাজবাড়ি থেকে কাব্য পাঠ করে ফিরুক তারপর রুদ্রভট্টকে রাজ সমীপে পাঠানোর কথা ভাবব।”^{৬১}

ধারণা করা হয়, প্রায় আড়াইশো বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশে এসরাজের উৎপত্তি। বীণা নয়, বাঁশি নয় কালিদাসের সমসাময়িক এক শিক্ষার্থী এস্রাজ বাজাচ্ছেন ভাবতেও আমরা কেমন শিহরিত হয়ে উঠি। যন্ত্রটা আবিষ্কারের জন্য বেশি না তখনও মাত্র চোদ্দ শো বছর দেরি!

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর ঋষি সত্যকাম, তাঁর শিষ্য খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কালিদাস, খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীজ্ঞান, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন একর বিস্তৃত ত্রিশরণ রক্ষিতের অট্টালিকায় বা বিক্রমাদিত্যের রাজপ্রাসাদের ঝাড়বাতি শোভিত সভাকক্ষে সুন্দর ‘পোশাক’ পরিহিত হয়ে ‘চাদর’ গায়ে দিয়ে বসে মাত্র আড়াইশো বছর আগে সৃষ্ট এস্রাজের নিপুণ বাদন শুনুন, আমরা বরং ইতিহাস-দেবীর পদতলে প্রণাম নিবেদন করে AI সুন্দরীর শরণাগত হই – কারণ সম্ভবত বাংলা উপন্যাসের কালান্তর তাঁরই হাতে ঘটতে চলেছে।

এতো গেল ইতিহাসের কথা তথা কালানৌচিত্য দোষের কথা; এবার আসি জীববিজ্ঞান প্রসঙ্গে। কালিদাসের নিষিক্ত বীর্ষ বা বিক্রমাদিত্যের নিষিক্ত বীর্ষে কথাটি লেখক বারে বারে ব্যবহার করেছেন। বয়স্য ভানুদত্ত বলছেন, –

“কালিদাস, ঐ যে তুমি লিখেছ না, শিবের নিষিক্ত বীর্ষ শুধু ধারণ করতে পারেন উমা। এই পঙ্ক্তি হল সব কথার সার কথা।”^{৬২}

নিষিক্ত বীর্ষ শব্দটির পৌনপুনিক ব্যবহারের সূত্রে অনুমিত হয় শব্দবন্ধটি লেখকের অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু কথাটি ভুল। বীর্ষ শব্দের বিশেষণ নিষিক্ত হতে পারে না, বীর্ষ নিষিক্ত করে ডিম্বানুকে এবং নিষিক্ত হয় ডিম্বানু তাই নিষিক্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হতে পারে ডিম্বানু বা ‘জাইগোটের’ ক্ষেত্রে, কখনোই বীর্ষের ক্ষেত্রে নয়।

কালিদাসের সঙ্গে ইন্দুমতীর শারীরিক মিলনের দীর্ঘ সময় পরে পাহাড়ি কন্যা ঘৃতকুমারীর সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের বিবাহ হচ্ছে, অথচ বিক্রমাদিত্যের ঔরসজাত ঘৃতকুমারীর সন্তান জন্মের পরেও কালিদাসের সন্তানের জন্ম হবে বলে দেখানো হয়েছে, যদি ধরেও নিই, ঘৃতকুমারী গর্ভধারণের সাতমাসে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, তা হলেও সময়ের হিসেব মিলছে না। কারণ কালিদাসের সঙ্গে ইন্দুমতীর প্রথম মিলন ভাদ্র পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষে, দ্বিতীয় মিলন হেমন্তকালের পূর্বে। অন্যদিকে বিক্রমাদিত্যের বিবাহ বসন্তোৎসবের সাতদিন পূর্বে। আবার হেমন্ত কালে দ্বিতীয় মিলনের পর বসন্ত পঞ্চমীর সামান্য পূর্বে হিমালয় ভ্রমণ শেষে ফিরে এসে কালিদাস শুনেছে ইন্দুমতী গর্ভধারণ সবে একমাস হয়েছে। কিছু পরেই ভামতী জানাচ্ছে ইন্দু ভরা পোয়াতি, এবং তার সন্তান “গভোর ভিতর যা হাত-পা ছুঁড়ছেন!”^{৬৩}

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপমা কালিদাসস্য উপন্যাস পাঠ কালে চমকিত হতে হয় নারী পুরুষের দৃষ্টিশক্তির পার্থক্য প্রসঙ্গে। কালিদাস নিদাঘ বৈকালে শিপ্রা নদী তীরে বসে আছেন শিশুপা গাছের নীচে এবং ইন্দুমতীকে প্রথম দেখছেন, কোথাও বলা নেই লুকিয়ে দেখছেন, গাছতলায় বসে জলে ঢিল ছুঁড়ছিলেন তখন ইন্দুমতী এল, জলে পা ডুবিয়ে বসে রইল এবং পরে স্নান করতে চাইল। তখনকার বর্ণনা এইরকম –

“আরেকটু পরে যুবতী উঠে দাঁড়ায় তার দুই বাহু তুলে কবরীর বন্ধন মুক্ত করল। কালিদাসের চোখ নিবন্ধ হল যুবতীর বাহুমূলের রোমরাজির দিকে। তার শরীরের শিহরণ ঘন হলো আরও।”^{৬৪}

নদী ক্ষীণ প্রবাহী, এতটাই ক্ষীণ যে এপারের যুবক ওপারের নবযুবতীর দিকে আলতো চোখ তুলেই তার বাহুমূলের লোমরাজি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। অন্যদিকে স্নানার্থী যুবতী গোটা কালিদাসকেই দেখতে পাচ্ছে না। নগ্ন হয়ে স্নানের উদ্যোগ করছে। ইন্দুমতী অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করেনি, এই বয়সে নারীর লজ্জা সর্বাধিক, সে কিছুই বোঝে না এমনটা

নয়, আবার পুরুষের বহু ব্যবহারে লাজ লজ্জা ভোলারও তার বয়স হয়নি। যে বোঝে সে নারী এবং পুরুষের চোখে আকর্ষণীয়। বিশেষত ইন্দুমতী সন্তানবতী নয়, অনুঢ়া, কাজেই লজ্জা আরও বেশি হওয়ার কথা। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের কোথাও বলেননি যে ইন্দুমতী অন্ধ বা কালিদাসের কাছে আতশ কাঁচ ছিল। এই অংশের বর্ণনায় বলা হয়েছে ইন্দুমতী আলুলায়িত কুন্তলা পরক্ষণেই বলা হয়েছে সে কবরী বন্ধন মোচন করেছে। বিস্ময়ে স্তব্ধ হতে হয় - নারী শরীরের বিভঙ্গ সদ্য তরুণ কবির চোখে স্পষ্ট করতে কবরী বন্ধন মোচন করানোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলে এটাও ধরে নিতে হয় মাঝের চার পঙক্তি রচনাকালেই লেখক আলুলায়িত কুন্তলা শব্দবন্ধটিকে স্মৃতি থেকে হারিয়ে ফেলেছেন। উপন্যাসের চোদ্দ পাতায় লেখক বলেছেন -

“অতীব রূপবতী যুবতীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ অতিক্রম করেনি।”^{৬৫}

পৃষ্ঠা একান্তে লেখক লিখছেন ইন্দুমতীর বয়স দ্বাবিংশতি। মাঝে একমাসও অতিবাহিত হয়নি। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনিতে বঙ্কল বাস হয়েছে পর্ণবাস, কালিদাস রাজা রানিকে দিয়ে অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্ অভিনয় করালে সীবন শিল্পীকে ডেকে পাতা সেলাই করে বঙ্কল বাস তৈরির নির্দেশ দেন রাজ আমাত্য।

উপমা কালিদাসস্য পড়তে গিয়ে বারে বারেই যে বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তা হল বাস্তবতার অভাব। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে হিন্দু ব্রাহ্মণ কালিদাসের হিমালয় দর্শনে যাওয়া কিছু কষ্ট কল্পনা বলে মনে হয়। কারণ বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিলই ব্রাহ্মণ্যবাদের মূলোচ্ছেদনের জন্য। তাই দুই ধর্মের মধ্যে বিরোধের আবহ থাকাটাই স্বাভাবিক। কালিদাসকে প্রদত্ত ঋষি সত্যকামের তাম্র ও রৌপ্যমুদ্রা যেভাবে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নিজেদের উদরপূর্তির জন্য ব্যয় করেছেন, তা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে কিছু মর্যাদাহানিকর। তারা যৌবন বয়সে উপস্থিত এবং এই বয়সে ক্ষিদে স্বাভাবিক ভাবেই বেশি হয় কিন্তু বৌদ্ধমঠের ত্যাগ ও তিতিক্ষার নিয়মের পাশে কালিদাসের থেকে প্রায় কেড়ে খাওয়া কোথাও যেন সম্মত হানি ঘটায়। কালিদাস বিব্রত বোধ করে যাত্রা পথে রওনা দেওয়ার সময় মহর্ষি কিছু মুদ্রা দিয়েছিলেন আপৎকালীন প্রয়োজনে লাগতে পারে বলে। মহর্ষি তাকে তাম্র মুদ্রার সঙ্গে কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রাও দিয়েছেন সেই তথ্য এখনই উচ্চারণ করল না। তাহলে অচিরেই ক্ষুধার্ত ভিক্ষুরা তাকে কপর্দকশূন্য করে দেবে। আবার অন্যদিকে হিন্দুদের মন্দিরে খাদ্য পাওয়া যাচ্ছ, বৌদ্ধ মঠে আধপেটা খেয়ে থাকতে হচ্ছে, লেখক কি নিজ ধর্মের প্রতি কিছুটা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে ফেললেন না এই কাহিনি বয়নের সূত্রে!

উপমা কালিদাসস্য উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনার যৌক্তিকতার অভাব রয়েছে। ত্রিশরণ রক্ষিত সন্তান জন্মের পর ইন্দুমতীকে ত্যাগ করেন। অথচ সন্তান জন্মের সম্ভাবনার কথা জানতে পেরে কিন্তু তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন এবং ইন্দুমতীর যত্ন বেড়ে গিয়েছিল। ভামতী কালিদাসকে জানায়, -

“বাবু বুঝতে পেরেছে এই সন্তান তার নয়। কিন্তু তা সে স্বীকার করেনি। সেদিন থেকে নেতৃত্ব করছে আর বলছে, ইন্দুর কোল আলো করে তিনি আসছেন।”^{৬৬}

আরও বলেছে, -

“ইন্দুকে আলাদা ঘরে রেখে কত তার আদর। এখন থেকে ধাইমা আসছে ইন্দুকে দেখতে। সবে একমাস, তাইতে তার কী যত্নআত্তির চলছে দিনরাত।”^{৬৭}

ইন্দুমতীও চিঠিতে কালিদাসকে জানায়, -

“শ্রেষ্ঠী জানেন এই সন্তান তাঁর নয়, অন্য কারও। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি এখনও আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। তাঁর প্রয়োজন ছিল একটি সন্তান, সেই সন্তানলাভের আনন্দে তিনি এখন আপ্ত।”^{৬৮}

ইন্দুমতীকে ত্যাগ করায় অবশ্য শাপে বর হয়েছে কালিদাস ও ইন্দুমতীর ভাগ্যে, কারণ অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে গর্ভবতী করা গেলেও তাকে ঘরে আনা যায় না, কিন্তু অন্যের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে ঘরে আনা যায় সহজেই। প্রশ্ন জাগে ত্রিশরণ রক্ষিত বিছানায় কিছু আর পারে না, বয়সের কারণে, সেকথা সদ্য যৌবনা ইন্দুমতীও জানে বৃদ্ধা দাসী ভামতীও জানে, কারণ তাকেও ত্রিশরণ রক্ষিত শয্যা সঙ্গিনী করেছে এককালে। ত্রিশরণের ছেলে চাই এই ছক চলছিল, তাই সে ইন্দুমতীকে তাড়িয়ে দেয় নি, কিন্তু সন্তানের জন্মের পর ইন্দুমতীকে সন্তান সহ ত্যাগ করেছে, এখানে ছক কেন লেখক পাল্টালেন তা ত্রিশরণ রক্ষিতের চরিত্রের যৌক্তিকতার দিক দিয়ে স্পষ্ট নয়। যিনি জানেন তিনি সন্তানের জন্ম দিতে অপারগ, তিনি স্ত্রী

গর্ভবতী হওয়ামাত্র তাকে ত্যাগ করবেন, অথবা সন্তানটিকে নিজের উত্তরাধিকার দিয়ে যাবেন বলে মেনে নেবেন এবং নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে নিজের পুরুষত্বহীনতার অপবাদ ঘোচাবেন এই পথদুটি যুক্তিগ্রাহ্য ছিল, কিন্তু কালিদাসের যতদিন পর্যন্ত ইন্দুকে স্থান দেওয়ার উপায় নেই, ততদিন তাকে নিজের কাছে রেখে সন্তানের জন্ম দিতে সাহায্য করা এবং পরে সন্তানসহ পরিত্যাগ করার পিছনে ত্রিশরণের হৃদয়ের মহত্ব অথবা নায়ককে সুবিধা করে দেওয়া এবংবিধ যুক্তি উঠে আসাকেই সাহায্য করেছে। সামান্য দুটি পঙক্তি লিখেই লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমস্যার মীমাংসা করতে পারতেন, ত্রিশরণ রক্ষিত সন্তানের জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন সামান্য একটু আশায়, কিন্তু সন্তানের মুখ, গায়ের রঙ ইত্যাদি দেখে যখন নিশ্চিত হন সন্তান তাঁর নয়, তখন পরিত্যাগ করেন। আসলে এই দ্বিধাটুকু তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতন ভাবেই পরিহার করেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস; কারণ নায়কের জন্য অন্যপূর্বা নারী যদিও নায়িকা হিসাবে দেওয়া যায়, একই সঙ্গে স্বকীয়া ও পরকীয়ায় নিরতা নারীকে নায়িকা করতে হয়তো তাঁর মনে দ্বিধা ছিল – কে না জানেন, হোটেলের ঘর, রেস্টুরেন্টের প্লেট ধুয়ে মুছে ব্যবহার করা চলে কিন্তু নারী বিশেষত নায়িকাকে ‘ভার্জিন’ হতেই হবে। তাহলে কি আমরা ধরে নেব পুরুষতান্ত্রিকতার চাপেই তিনি ইন্দুমতী ও ত্রিশরণ রক্ষিত চরিত্রদুটির এবংবিধ রসায়ন রূপায়ণ করেছেন!

পূর্বজ লেখকের নাম উল্লেখ ছাড়াই তাঁর কাহিনির ধারা অনুসরণ করেছেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে উল্লেখ্য যে নদী তীরে বসে কালিদাসের নারীর স্নান দৃশ্য অবলোকন করা, এই বিষয়টিও কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব কল্পনার সৃষ্টি নয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিখ্যাত ছোট গল্প ‘অষ্টম সর্গে’^{৬৬} আমরা অনুরূপ দৃশ্য অনেক আগেই পেয়েছি। কিন্তু তফাৎ হলো সেখানে ছত্রিশ বছর বয়সী কালিদাস যৌবনের উপাঙ্গে থেকেই কিন্তু নাগরিকাদের সশ্রদ্ধ সম্মান আদায় করতে পেরেছেন, কারণ তিনি ব্রাহ্মণকুলজাত এবং শুদ্ধ চরিত্রের মানুষ। তাই সকল স্নানার্থী যুবতীই তাঁকে চেনেন, শ্রদ্ধা করেন, তাঁর কাব্য তাদের কাছে পরিচিত, তারা কবিকে ভট্ট বলে সম্বোধন করেছেন এবং যুবতীদের মধ্যে সবচেয়ে মুখরা কালিদাসের প্রশ্ন দেবদেবীর বিবাহের পর কাব্যকে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ভট্টনীকে এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করেছেন। ‘অষ্টম সর্গ’ গল্পে আমরা দেখি লোলা নামে এক নারীর স্বামী নাবিক হওয়ার সূত্রে বাইরে থাকায় তিনি লোলাকে সান্ত্বনা দেন এবং তার স্বামী শ্রেষ্ঠীকে নিয়ে নিরাপদে দেশে ফিরেছেন এই কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করেন। এতে লোলা প্রাণ ফিরে পায় এবং কবির চরণে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রণাম জানায়। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীও শুরু হয় নদী কূলে নারীর স্নান দৃশ্য অবলোকনের মাধ্যমে। কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিদাসের তুলনায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিদাসের রুচি কতখানিই না আলাদা।

অতীত ইতিহাস পাঠের সূত্রে পাঠকের মনে ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে যে বিশালত্বের ধারণা গড়ে ওঠে তা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর দৌহিত্রের রাজ্য প্রাপ্তিতে বাধা আসতে পারে মনে করে তাঁর রাজ্য থেকে মাত্র দু - হাজার সৈন্য নিয়ে আসেন মন্ত্রী সুহিতদত্তের সহায়তায়। বিক্রমাদিত্যের তিন রানি কুবেরনাগা, ধ্রুবাদেবী এবং ঘটকুমারীর যথাক্রমে দুই, দুই ও তিনজন করে সহচরী আছে। বিক্রমাদিত্যের দুই রানি সংস্কৃত জানেন না, প্রাকৃত সচ্ছন্দ। পড়তে পড়তে মনে হয় সব কিছুই যেন উনিশ শতকের শেষার্ধ বা বিশ শতকের প্রথমার্ধের জমিদার বাড়ির গল্প। শুধু সংস্কৃতের স্থলে ইংরেজি বসিয়ে নিলেই এ একেবারেই উনিশ শতকীয় কাহিনি। কেবল ততটুকু মাত্রই প্রসারিত হতে পেরেছে জীবনযাপনের মান। রাজা বিক্রমাদিত্য অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পাঁজাকোলা করে রাজসভায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সভা করার জন্য নয়, প্রধান আমাত্যের সঙ্গে আলোচনার জন্য। সাধারণত রাজ পরিবার বা ধনী পরিবারে অসুস্থ পরিবার প্রধানকে অন্দর বাহিরের মধ্যবর্তী একটি ঘরে রাখা হয়, এবং প্রয়োজনে সেখানে রাজ অন্তঃপুরিকারা এসে সেবা করতে পারেন, প্রধান আমাত্য এসে পরামর্শ করতে পারেন। কিন্তু তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস পাঠ কালে পাঠককে ধরে নিতে হবে হুনকেশরী বিক্রমাদিত্যের সেই রকম কোন ঘর নেই, তাই তাঁকে পাঁজাকোলা হয়েই ‘অন্দর-বাহিরে’ যাতায়াত করতে হবে – এবং পাঠক ভেবে আরও আশ্চর্য হবেন যে এ কেবলমাত্র কালিদাসকে ঘটকুমারীর মুহূর্মুহ চুম্বনদানের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। কালিদাস সেই চুম্বন পাবেন, দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরা দেবেন কিন্তু ইন্দুমতীর প্রতি অন্যায় হল বুঝি – এই পাপবোধের কারণে ঘরে ফিরে পুষ্করিণীতে ফেনক (এখানে ফেনক শব্দের ব্যবহার খুব সুন্দর) মেখে প্রচুর স্নান করবেন। পরে কালিদাস আবার কাব্য পাঠ করতে গেলে

বিক্রমাদিত্য ঐ রকম পাঁজাকোলা হয়ে রাজসভায় গেছেন, কালিদাস আশা ও আশঙ্কা করেছে রানি ঘৃতকুমারী তাকে আবার না চুশন করতে আসেন, কিন্তু দেখা গেছে এবার রাজা এক দ্বাররক্ষীকে গৃহদ্বারে পাহারায় নিযুক্ত করেছেন। অথচ কালিদাসের এই ফেনক মেখে স্নান করার বিশেষ কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না, কারণ কালিদাস রানি ঘৃতকুমারীর বিবাহের সাতদিনের মধ্যে আয়োজিত কাব্যপাঠের আসরেই দেখেছিলেন ঘৃতকুমারী তাঁকে বিশেষ চোখে দেখেছেন এবং কবি কালিদাস ও পরবর্তী নানা কাব্য ও নাটক পাঠের আসরে ঘৃতকুমারীর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকেছেন, সে তাকানো এতটাই বিহ্বলকর যে প্রধান আমাত্য ও ভানুদত্ত কালিদাসকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কাব্যপাঠে অগ্রসর হতে। আবার কোনদিন কাব্য পাঠের আসরে রানি ঘৃতকুমারী উপস্থিত না থাকলে কালিদাস মনে মনে দুঃখ করেছেন। অন্য দুই রানির উপস্থিতিও ঘৃতকুমারীর অনুপস্থিতির প্রলেপ হয়নি। কালিদাস সেই পাঠের আসরে মনমরা থেকেছেন। তাই ঘৃতকুমারী ও কালিদাস উভয় তরফেই কিছুটা প্রশয় মিশে ছিল সম্পর্কের ক্ষেত্রে - এমনটা বলা যেতেই পারে। তাহলে ফেনক মেখে স্নান করার প্রসঙ্গের একটাই ব্যাখ্যা তা হল ইন্দুমতী যেন ঘৃতকুমারীর গায়ের গন্ধ না পায়, অর্থাৎ প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছে তৎপরতা এবং কালিদাস ভাবছে রাজা বিক্রমাদিত্যও হয়ত ঘৃতকুমারীর গায়ে পরপুরুষ কালিদাসের গায়ের গন্ধ আবিষ্কার করেই তাঁর অনুপস্থিতিতে পাহারার ব্যবস্থা করিয়েছেন। এই পাহারার প্রসঙ্গ ঘরে-বাইরে^{১০} উপন্যাসে বিমলাকে সন্দীপের মুঠি থেকে বাঁচাতে বিমলার মেজ জা ও বড়ো জার ননকু দারোয়ানকে নিয়োগের মতোই অসহায় প্রয়াস বলে মনে হয়।

পূর্ব থেকেই কালিদাসের উপস্থিতি তাঁর সংসার-জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে তা জ্যোতিষীর বিচার অনুযায়ী বিক্রমাদিত্য জানতেন, তা সত্ত্বেও তিনি কালিদাসকে রাজপ্রাসাদেই রেখে দেন। ভাবতে ভালো লাগে - কালিদাসের সন্দেহ অনুযায়ী স্ত্রীর গায়ে অন্য পুরুষের গন্ধ পাওয়ার পরও বিক্রমাদিত্য কেবল দ্বারবান নিযুক্ত করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন, ভুল্লের আগায় কালিদাসের মুণ্ডটি গোঁথে নিচ্ছেন না, কী অসাধারণ সংযম!

ত্রিশরণ রক্ষিতের সঙ্গে ইন্দুমতীর যেমন বয়সের ব্যবধান, বিক্রমাদিত্যের সঙ্গেও ঘৃতকুমারীর প্রায় তেমনই বয়সের ব্যবধান, তফাৎ শুধু ঘৃতকুমারীকে বিবাহের পর বিক্রমাদিত্য দুটি সন্তান উপহার দিতে পেরেছেন। অষ্টাদশী ঘৃতকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয় প্রৌঢ় বিক্রমাদিত্যের। ফলে ঘৃতকুমারীর অবদমিত কাম কালিদাসের প্রতি আকর্ষণের কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কিন্তু সেখানে উপমাও নেই, কালিদাসও নেই। এই অংশে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর রানী কুবেরনাগাকে নিয়ে অশ্বারোহী হয়ে জামাতা বাকাটক রাজ রুদ্রসেনকে দেখতে যান।

“অতি প্রত্যুষে অশ্বারোহী হয়ে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী থেকে যাত্রা করলেন বাকাটক রাজ্য অভিমুখে তার পশ্চাতে উপবিষ্টা নাগ রাজকন্যা রানি কুবেরনাগা।”^{১১}

রাজা ও রানির ঘোটকযাত্রা মনে করিয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজসিংহ^{১২} উপন্যাসের মানিকলাল ও নির্মলকুমারীর অশ্বারোহন পর্বকে। রুদ্র সেনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে শুরু হয় এক গভীর ষড়যন্ত্র। রুদ্র সেনের বৈমাত্র্যে ভ্রাতা শশাঙ্ক সেন কয়েকজন সেনাধ্যক্ষকে নিয়ে রাজ সিংহাসনে কার অভিষেক হবে সে বিষয়ে আলাপে নিরত হন। রাজ্যের প্রধান আমাত্য শান্তভব কোনমতেই চাইছিলেন না শশাঙ্ক সেন কোনমতে হন বাকাটক রাজ্যের রাজা। তার সঙ্গে সহমত হয়েছিলেন প্রধান সেনাধ্যক্ষ। অন্য তিন সেনাধ্যক্ষ শশাঙ্ক সেনের পক্ষে থাকায় যখন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য সেই সময় বিক্রমাদিত্য সিদ্ধান্ত নেন তাঁর জামাতা রুদ্রসেনের নাবালক জ্যেষ্ঠপুত্র দিবাকর সিংহাসনে বসবে এবং তার কন্যা প্রভাবতীই তাকে রাজকার্য সম্পাদনে সাহায্য করবেন প্রধান আমাত্য শান্তভব ও প্রধান সেনাধ্যক্ষের সহায়তায়। এই পর্যন্ত টানটান কাহিনি পড়ে পাঠক যখন মোহিত তখনই কাহিনীতে আসে এক বৈপরীত্য। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির করেই নিয়েছিলেন যৌনতা ও প্রেম তাঁর এই উপন্যাসের চালিকা শক্তি হবে। ফলে তিনি আবার কাহিনিকে নিয়ে যান সেই স্বকীয় ক্ষেত্রে। জামাতা তাঁরই জন্য যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ দিলেন, কন্যা বিধবা হয়েছে, জ্যেষ্ঠ নাতি রাজসিংহাসনে আরোহন করেছে - সেই অবস্থায়, মহারাজা বিক্রমাদিত্যের দৃষ্টি পড়লো কক্ষে উপস্থিত এক সুন্দরী তরুণীর প্রতি - বাকাটকের পাহাড়ি আবহাওয়ায় লালিত এই কন্যাটির অসামান্য রূপ আপ্ত করল তাঁকে তরুণীর উদ্ধত স্তন ও শরীরের বন্যতায় তিনি নিমজ্জিত বিভোর কিন্তু

তরুণীর দুই চোখ কেন বিভ্রান্ত? কেন ভয়াবহ? জানতে পারলেন তরুণীর নাম ঘৃতকুমারী, সে সম্পর্কে শশাঙ্ক সেনের ভগিনী। সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন কন্যাটিকে বন্দী করে নিয়ে যেতে। অতঃপর রাজধানীতে ফিরে রাজ জামাতা বিয়োগের শোক ও দৌহিত্রের রাজাভিষেকের উল্লাস মিটে না মিটে বসন্ত পঞ্চমীর সাতদিন আগে পাহাড়ি কন্যা ঘৃতকুমারীকে রাজা বিক্রমাদিত্য বিবাহ করবেন বলে মনস্থ করলেন ও বিবাহ করলেন। মনে রাখতে হবে ঘৃতকুমারী বিক্রমাদিত্যের জামাতা রুদ্র সেনের বৈমায়েয় ভগিনী। তাই সম্পর্কে কন্যা সমা অর্থাৎ পুত্রী। বিদ্যাসাগর কৃত বেতাল পঞ্চ বিংশতি^{১০} গ্রন্থের শেষতম কাহিনীতে বেতাল যে গল্প বলেছিল তাতে এক অরণ্যে মাতা ও কন্যা মনের দুঃখে চলে যান। সেখানে মৃগয়া করতে রাজা ও রাজকুমারও গিয়েছিলেন, রাজা কুমারী কন্যাকে ও রাজপুত্র কন্যার মা মহিলাকে বিবাহ করেন, বিক্রমাদিত্যের কাছে বেতালের প্রশ্ন ছিল যে এদের যখন সন্তান হবে তখন তারা পরস্পরকে কী বলে ডাকবে? উত্তরে বিক্রমাদিত্য বলেছিলেন এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর জানা নেই। শর্ত অনুযায়ী মাথা ফাঁক হয়নি বিক্রমাদিত্যের, কারণ সত্যিই এই প্রশ্নের উত্তর হয় না। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন নিজের জীবনেই বিক্রমাদিত্য প্রায় সেই রকমই এক অমীমাংসিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠে তুলেছেন, তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত তাঁর মেয়ের সন্তানদের কোন সম্পর্ক ধরে ডাকত? মামীমার সন্তান রূপে ভাই বলত, নাকি বাবার নাতি হিসেবে বোনপো বলত, আমাদের জানা নেই!

তখন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ উপন্যাস উপমা কালিদাস্য একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ হয়ে উঠতে পারত কালানৌচিত্য দোষ বর্জন করতে পারলে এবং সংস্কৃত শ্লোকের বহুল ব্যবহার পরিহার করতে পারলে। কালিদাসের কাব্য ও নাটক সম্পর্কে জানার জন্য তো সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভারই রয়েছে। সেখানে মূল ও অনুবাদ সহজেই পেতে পারেন পাঠক। বিশেষত কালিদাসের জীবনীকেন্দ্রিক চমৎকার একটি উপন্যাস রয়েছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যা সর্বজন-প্রিয়। তাই সেই একই বিষয়ে কলম ধারণের সময় শ্রদ্ধেয় তখন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও সচেতন হওয়া উচিত ছিল। প্রাচীন যুগকে আঁকতে হলে সে যুগের ভালোমন্দ সহ তাকে উপস্থিত করাই যুক্তি যুক্ত, তাতে যদি নারীর অবস্থানকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক রূপে দেখাতে হয় – হবে, কারণ সেটাই যুগ-সত্য। অন্যথায় নারীর দুঃখ মোচনের জন্য তার হাতে সহজ-সুখকে তুলে দিতে গেলে যুগধর্মও ক্ষুণ্ণ হবে, জীবনের সত্যও রক্ষিত হবে না। নবীন প্রজন্ম ধরে নেবে নীতি হীনতাই সেযুগের নীতি ছিল।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সেকাল, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬১
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৩৮, কলকাতা, পৃ. ৩৫৯
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, কুমারসম্ভবের কবি, শরদিন্দু অমনিবাস, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই ১৯৯১ পৃ. ৩৭৫
৪. তদেব, পৃ. ৩৭৫
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৩৮, কলকাতা, পৃ. ৩৬১
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, কুমারসম্ভবের কবি, শরদিন্দু অমনিবাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৯৪
৭. তদেব, পৃ. ৪২৭
৮. তদেব, পৃ. ৪২৭
৯. তদেব, পৃ. ৪২৯
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৩৮, কলকাতা, পৃ. ৩৫৯
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, উপমা কালিদাস্য, দে'জ পাবলিশিং, ২০২৬, কলকাতা, প্রচ্ছদ কথা।
১২. তদেব, লেখকের কথা।
১৩. তদেব, লেখকের কথা।
১৪. তদেব, লেখকের কথা।
১৫. তদেব, লেখকের কথা।

১৬. তদেব, লেখকের কথা।
১৭. উপমা কালিদাসস্য, সূচনাংশ। পৃ. ৯
১৮. উপমা কালিদাসস্য, পৃ. ৯
১৯. তদেব, পৃ. ৯
২০. তদেব, পৃ. ১১
২১. তদেব, পৃ. ৫৩
২২. তদেব, পৃ. ৫৭
২৩. চণ্ডীদাস, বড়ু, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সম্পাদক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৯, কলকাতা।
২৪. প্রবাদ বা সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের প্রশস্তি শ্লোক, প্রচলিত।
২৫. দাশগুপ্ত, ড. শশিভূষণ, উপমা কালিদাসস্য, সাহিত্য জগৎ, ১৯৩৮, কলকাতা।
২৬. উপমা কালিদাসস্য, পৃ. ৮৭
২৭. তদেব, পৃ. ৮৭
২৮. সরস্বতী, জয়দেব।
- “যদি হরি স্মরণে সরসং মন, যদি বিলাস কলায়ু কুতুহলম্, মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।”
- সূচনা শ্লোক, গীতগোবিন্দম্।
২৯. উপমা কালিদাসস্য, পৃ. ৩৯
৩০. তদেব, পৃ. ৩৯
৩১. তদেব, পৃ. ৬৩
৩২. তদেব, পৃ. ৬৩
৩৩. তদেব, পৃ. ২৮
৩৪. তদেব, পৃ. ১২৯
৩৫. তদেব, পৃ. ১২৯
৩৬. তদেব, পৃ. ১২৯
৩৭. তদেব, পৃ. ১২৯
৩৮. চাণক্য, দণ্ডনীতি, দণ্ডনীতি প্রসঙ্গে কৌটিল্য, কৌটিল্য : প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-রাজনীতি, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলনের ধারা, পৃ. ৯৪
৩৯. সরস্বতী, জয়দেব, গীতগোবিন্দম্, রাধাকৃষ্ণ প্রণয় কাব্য।
৪০. উপমা কালিদাসস্য, পৃ. ৬৭
৪১. তদেব, পৃ. ৬৯
৪২. তদেব, পৃ. ৬৯
৪৩. তদেব, পৃ. ৭০
৪৪. তদেব, পৃ. ৭১
৪৫. তদেব, পৃ. ৭১
৪৬. তদেব, পৃ. ৯২
৪৭. তদেব, পৃ. ৯২
৪৮. তদেব, পৃ. ১৩৩
৪৯. তদেব, পৃ. ১৯৫
৫০. John Lyly's 1578 novel Euphues : The Anatomy of Wit.

৫১. ফ্রেড, সিগমুন্ড, লিবিডো, <https://www.news-medical.net>
৫২. গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ১/৩, ১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ, কলকাতা।
৫৩. তদেব
৫৪. শর্মা, শ্রী শিতিকর্ষ, প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি ও বিচার পদ্ধতি, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৫, প্রচ্ছদ
৫৫. চাণক্য শ্লোক।
৫৬. তদেব
৫৭. উপমা কালিদাসস্য, পৃ. ৮৮
৫৮. তদেব, পৃ. ২২৫
৫৯. তদেব, পৃ. ৫০
৬০. তদেব, পৃ. ২৭১
৬১. তদেব, পৃ. ৪৫
৬২. তদেব, পৃ. ১৬৪
৬৩. তদেব, পৃ. ১৫৮
৬৪. তদেব, পৃ. ১৩
৬৫. তদেব, পৃ. ১২
৬৬. তদেব, পৃ. ১২৯
৬৭. তদেব, পৃ. ১২৯
৬৮. তদেব, পৃ. ১৫৯
৬৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু, অষ্টম সর্গ, ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮
৭০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঘরে-বাইরে, বিশ্বভারতী, ২০০০, কলকাতা।
৭১. উপমা কালিদাসস্য, পৃ. ১১৭
৭২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজসিংহ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৮৮২, কলকাতা।
৭৩. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০, কলকাতা, ISBN : 978-8177565799

Bibliography:

- বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন কুমার, উপমা কালিদাসস্য, দে'জ পাবলিশিং, ২০২৬, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৩৮, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৯৬২/১৯৬৩ সাল), কলকাতা।
- দাশগুপ্ত, ড. শশিভূষণ, উপমা কালিদাসস্য, সাহিত্য জগৎ, কলকাতা, ১৯৩৮
- শর্মা, শ্রী শিতিকর্ষ, প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি ও বিচার পদ্ধতি, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৫